অ সং ল গ্ন

অসংলগ্ন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রাপ্তিস্থান :

নিওলিট পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিঃ

১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শ্রীপরিমল গোস্বামী

বন্ধুবরেষু—

এই লেখকের লেখা

কবিতা : সাগর থেকে ফেরা, কখনো মেঘ, প্রথমা ইত্যাদি।

প্রবন্ধ : বৃষ্টি এলো, বর্বর যুগের পর ইত্যাদি।

উপন্যাস : প্রতিধ্বনি ফেরে, স্তব্ধ প্রহর, মৌসুমী ইত্যাদি।

গল্প : কচিৎ কখনো, অঙ্কুরস্থ, স্বনির্বাচিত গল্প ইত্যাদি।

নাম নিয়ে সত্যি ফাঁপরে পড়েছিলাম। কি নাম দেওয়া যায় এই লেখাগুলোর? কি নাম দিলে এ সব লেখার সাড়ে বত্রিশ ভাজা মেশানো ভাবনা চিন্তা জল্পনাকল্পনার কিছু হদিস মিলতে পারে। আকাশপাতাল ভেবে অনেক নামই মাথায় এসেছিল। নাম খোঁজার হাঙ্গামা যেমন, তেমনি একটা বিলাসও আছে। এক-আধটা নাম বেশ চমকদার লেগেছে। কিছুক্ষণের জন্যে মনে ধরেছে। যেমন সমাচার সমুচ্চয়। মানে না হোক মজা ছিল বোধহয় নামটায়। সেকেলে শব্দের একটা রণন! সেকেলে শব্দের এই রণন অবশ্য নানা রকমের। কখনো সে শব্দ মনে একটা আবেশ আনে কল্পনা ও স্মৃতির সঙ্গে মেশানো। ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় কি স্বগত মতবিভঙ্গ-কারিকা নাম শুনলে যেমন হয়, ওগুলির অর্থ জানি বা না জানি। প্রথমটি বৌদ্ধ ন্যায়ের একটি বই ও দ্বিতীয়টি সূত্র-গ্রন্থ, এ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও সে আবেশ কাটে না। বিনিশ্চয় ও কারিকা শব্দের প্রয়োগ আর আমাদের ভাষায় নেই বলেই তারা যেন মধুর এক রহস্যে মণ্ডিত হয়ে গেছে। আরেক ধরণের পুরানো সেকেলে শব্দের অনুষঙ্গ আলাদা। তারা মনে যেন ঈষৎ কৌতুকের হাসি জাগায়। সমাচার সমুচ্চয় মনে হয়েছিল সেই রকম। সমুচ্চয় ত নয়ই, সমাচার শব্দেরও এক কবিতায় ছাড়া আমাদের যুগের ভাষায় গতি বিধি আর নেই। সমাচার কথাটা খৃষ্টান প্রচারকরাই বোধহয় প্রথম চালু করেছিলেন বাংলায়। লুক কি মথি লিখিত সুসমাচারের সাহায্য পেয়েও সে শব্দ বেশী দিন কালস্রোত পার হতে পারেনি।

বাতিল শব্দের চোরকুঠরিতে জমা হয়ে আছে। সেই চোরকুঠুরি থেকে উদ্ধার করে প্রথমটা খুশিই হয়েছিলাম। যাঁদের শোনালাম তাঁদের কেউ নাক সেঁটকালেন না, কিন্তু কেউ বললেন বড় ভারী কেউ বা বললেন বেমানান। সুতরাং নিজের মমতাটুকু বিসর্জন দিয়ে আবার চোরকুঠুরিতেই ফেরত পাঠাতে হল। নাম কিন্তু একটা না দিলে ত নয়। নাম নিয়ে অত ভাবনা কিসের যাঁরা বলেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। নামে কি আসে যায়, বলে সেই বিখ্যাত কবিতার কলিটি সত্ত্বেও। আসে যায় বই কি! গোলাপ গন্ধ ঠিকই দেয় বটে, রূপ আর গন্ধের সঙ্গে মিলেই গোলাপ শব্দটা হয়ত মধুর হয়ে উঠেছে। তবু বিদ্‌ঘুটে একটা নাম যদি তার থাকত মনের সুর কেটে যেত না কি! সুন্দর জিনিসের বিদ্‌ঘুটে নাম হয় না, যদি কেউ মনে করেন, তাহলে কানের সামনেই জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথিবীর মধুরতম একটি বস্তুর বিদ্‌ঘুটে বেসুর একটি আখ্যা,—বিদ্‌ঘুটে অন্তত পাত্র বিশেষে। হিন্দি ছবি এক-আধবারও যিনি দেখেছেন মহব্বৎ শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়েছে নিশ্চয়ই। মহব্বৎ মানে প্রেম জেনে প্রথমে ত প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড়। বিদ্‌ঘুটে লাগাটা হয়ত কানের অভ্যাস, কিন্তু ভাষায় কানের অভ্যাসটাই ত সব। না, নামে অনেক কিছু আসে যায়। শুধু নাম নিয়ে বাড়াবাড়িটা ভালো নয় নিশ্চয়। যেমন ছেলেমেয়ের নামকরণ নিয়ে আমরা অনেক সময়ে করে থাকি। ছটির পর সাতটি কন্যারত্ন হলে আগে ঘেন্না পিত্তি ডেকে মনের ক্ষোভ মিটত জানি। এখন আশা করি তার প্রয়োজন হয় না। এখন কিন্তু উল্টো আতিশয্যই, অর্থাৎ যাকে বলে আদিখ্যেতা বেড়েছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কত হাজার কবিতা লিখেছেন ঠিক জানি না, কিন্তু নামকরণের তাগাদা তার চেয়ে বোধহয় কম পাননি। রবীন্দ্রনাথ নেই, তাঁর জায়গায় ছোট ন' কবি সাহিত্যিক যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ

বোধহয় স্নেহাই পান না। বাপ মার পরিচিত হলে ত আর কথাই নেই। নামের ফরমাশ রাখতে নাকালের শেষ। নাম আবার যেমন তেমন হলে চলবে না। ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত না হয়। তার মধ্যে বিশেষের ছাপ চাই অর্থাৎ অসাধারণত্ব। বাংলা দেশের জন্মহার নিশ্চয়ই পড়তি নয়। সবাই অসাধারণ নাম দিতে চাইলে ত অভিধানেও কূল পাওয়া যায় না। আর অসাধারণ ত অনেক প্রকারের হতে পারে। প্রায় আঁতকে ওঠবার মত। এ যুগের নয় আরেক যুগের সেরকম নাম একটি অন্তত জানি। বিশ্বাস কেউ করুন বা না করুন স্বর্গত এক ভদ্রলোকের নাম ছিল নির্দুঃখীচরণ। নির্দুঃখীচরণ বেশ পরিণত বয়সে গত হয়েছেন বলে জানি। বাপমার দেওয়া নামের মধ্যে যে আশীর্বাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা অন্য সব ক্ষেত্রে যতই ফলুক এই নামের ব্যাপারে তাঁকে আজীবন কাঁদিয়ে ছেড়েছে বলেই সন্দেহ হয়। নির্দুঃখীচরণ অবশ্য যাকে বলে একেবারে চরম উৎকট দৃষ্টান্ত, কিন্তু বাপমার নামকরণের সোহাগে ছেলেমেয়ের চিরবিড়ম্বিত হয়ে থাকার ব্যাপার এ যুগেও বিরল নয়। ছেলেমেয়ের নামের বেলা এস্পারওস্পার, দুই এড়িয়ে মাঝারি মানানসই নাম দেওয়াই সঙ্গত নয় কি? ছেলেমেয়েরা কেউকেটা হলে নামটা যাতে সোনার কলসীতে ভাঙা সরার ঢাকনি না হয় আবার তারা সামান্য সাধারণ হলে কাকতাড়ুই-এর মাথায় জরির তাজ হয়ে না বিদ্রূপ করে। চেনবার জন্যে, চিহ্নিত করবার জন্যেই নাম, সে নাম সহজ সংক্ষিপ্ত হলে ত সব দিকেই সুবিধে। অবশ্য পুরোপুরি যান্ত্রিক সুবিধার জন্যে রক্তকরবীর রাজ্যের ক তিন ছ দশ নামের কথা বলছি না। নামের একটা ধ্বনিমূল্য ও মাধুর্য না থাকলে নয়। নামের অর্থ থাকাটা কিন্তু একেবারে অপরিহার্য কি? নামের অর্থ ধরে কাউকে নিশ্চয় আমরা স্মরণ করি না। অর্থগৌরবে দামও বাড়ে না কারুর। সুতরাং নামটা শুধু সুশ্রাব্য হলেই যথেষ্ট নয় কেন? সব

দেশেরই নামের বিবর্তনের ইতিহাস নিশ্চয়ই মজার। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছরেই ত চোখের সামনে সব ধারা বদলাতে দেখছি। ক্ষেমঙ্করী, কাদম্বিনী, অঘোরময়ী কি মোক্ষদার মত নাম এখনকার মেয়েদের মধ্যে অভাবনীয়, ছেলেদের হেমেন্দ্র, রবীন্দ্র, নরেন্দ্র জাতের নাম এখনো সচল আছে, কিন্তু, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, বিহারীলাল যদুপতিরা বিলুপ্ত না হলেও এখনকার কিশোর তরুণদের মধ্যে একান্ত বিরল। ঠাকুর দেবতার নামের ভিত্তিতে কিংবা কোন একটা অর্থ মনে রেখেই নামকরণ করার রীতি চলে আসছে এতকাল। সে অর্থ যদি বাদ দেওয়া হয়, এমন কিছু লোকসান হয় বলে ত মনে হয় না। আমাদের মন যখন দেশকালের সঙ্কীর্ণগণ্ডিতে আর বদ্ধ নয়, তখন নাম সংগ্রহের ক্ষেত্র ছড়িয়ে দিতে আপত্তি কিসের? যতই ওকালতি করি আপত্তি সহজে যাবার নয় জানি। এক সোদরপ্রতিম বন্ধুর পুত্রসন্তানের নামকরণ করে কোন এক সাহিত্যিকের বিপদের কথা জানি। আদ্যাক্ষর মিলিয়ে বৈশিষ্ট্য আর নতুনত্ব দেবার জন্যে তিনি নাকি প্রস্তাব করেছিলেন নবজাতকের সিন্ধবাদ নাম দেবার। ভেবেছিলেন আরব্য উপন্যাসের সমস্ত রহস্যরোমাঞ্চমণ্ডিত এ নাম পেয়ে বন্ধু-দম্পতির আনন্দের আর সীমা থাকবে না। শুনেছি বন্ধুজায়া সে সাহিত্যিকের মুণ্ডপাত করে তাঁর মস্তিষ্কের চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। না, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাশিয়ার বিপ্লবের যত বড় নজিরই থাক, নামের রাজ্যে ছোটখাট অদল-বদল হলেও যুগান্তকারী বিপ্লব সহজে হবার নয়। জগজ্জনহিতায় একটা বিপ্লবের প্রয়োজন যদিও একান্ত বলে মনে হয়। সে বিপ্লব ঠিক নামের ক্ষেত্রে নয়, পদবীর ব্যাপারে। এই পদবীরূপ লেজুড়টি দুনিয়ার অনেক অনর্থের মূল। এই পদবীর ছলে মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকে শুরু করে আমাদের মনের অনেক সঙ্কীর্ণ দম্ভ ও আত্মম্ভরিতাই লুকিয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত

মূল্য বংশপরিচয়ের ঠেলায় ঠেলে তোলা হয়। যে সাম্যের সমাজ আমাদের আদর্শ, পদবীর এই লেজুড়টুকু খসালে অলীক ভেদাভেদ ঘুচে সেদিকে অগ্রসর হবার রাস্তা যে সুগম হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অমুক জানা, কি অমুক চক্রবর্তী, অমুক মিত্র কি সিংহ না হয়ে আমরা যদি শুধু স্বনামের পরিচয়টুকুই বহন করি, তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ ও দুনিয়া অচল হবার কোন কারণ নেই। কোন কোন ধর্মে ও সমাজে এ রেওয়াজ আগে থাকতেই আছে। অবশ্য পদবী না থাকলেও তার জড় সেখানে একেবারে নেই এমন কথা বলতে পারব না। তবু তাও মন্দের ভালো।

ধৈর্য ধরে এতদূর পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম বলে যদি তাঁদের মনে হয় তাহলে বুঝব, শেষ পর্যন্ত এই রচনার যে শিরোনামটি পেয়েছি তা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

পদবী বিলোপ কোনদিন সত্যি সম্ভব হবে কি না জানি না, কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামি ও ব্যক্তিগত অহমিকার উস্কানি ছাড়াই একটি দল প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধতা করবেন বলে মনে হয়। তাঁরা হলেন সামাজিক নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী। মাটির তলায় লুপ্ত সভ্যতা যেমন উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকে এই পদবীর ভেতরেও মানবগোষ্ঠীর অনেক বিস্মৃত ইতিহাস তেমনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের দেশের সামাজিক নৃতত্ত্বের গোড়া-পত্তনই ভালো করে হয়নি বললে হয়। তাই তাঁদের সন্ধানী গবেষণার একটা বড় সূত্র কাজের শুরুতে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনায় বৈজ্ঞানিকদের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সেই উভয় সঙ্কট যদি সত্যিই দেখা দেয়। কার দাবি আগে মানবার। অতীত না ভবিষ্যৎ ?

ভোরে উঠে সেদিন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে সন্দেহ হল সত্যি জেগে উঠেছি না এখনো ঘুমের ঘোরেই আছি। সন্দেহের কারণ আমার পরিচিত জগৎ চারিধারে কোথাও দেখতে পেলাম না। ঘুমের মধ্যে আমার দোতলার ঘরটা আমায় নিয়ে কোন অজানা লোকে যেন চলে এসেছে। এ শুধু অজানা লোক নয় প্রায নিরাকার আদি সৃষ্টির জগৎ। পরমশিল্পী যেন সবে বস্তুর ধ্যানে বসেছেন। শূন্য পটে আবছা রঙের প্রলেপ পড়েছে, এখনো তা রূপ নেয়নি স্পষ্টতার। সঙ্গীতের যেমন তালমান গৎ বাঁধা ছকের আগে সুরের আলাপ, এও যেন তেমনি আলাপ সৃজনের।

এটুকু লিখতে যতক্ষণ লাগল তার আগেই আমি অবশ্য বুঝেছিলাম যে ব্যাপারটা কুয়াশা ছাড়া কিছু নয। ঘন-কুয়াশায় দিগ্বিদিক বিলুপ্ত হয়ে আমার নিত্য পরিচিত পরিবেশের এই চেহারা হয়েছে। সকাল বেলার এ কুযাশা বৎসরের এই সময়টায় বিরল নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রভাতে তার এমন একটি প্রকাশ ছিল যা সচরাচর দেখবার সৌভাগ্য হয় না। এ কুহেলিকা নগরের সেই ধুলো-ধোঁয়ার ভেজাল মেশানো নোংরা আবরণ নয়। এ কুয়াশাও অস্বচ্ছ কিন্তু নির্মল। রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত গ্লানি মুছে রেখে এসে একটি শুদ্ধ প্রসন্নতা সে বুঝি অর্জন করেছে।

শুধু নির্মল প্রসন্নই নয় এ কুজ্ঝটিকা আরেক দিক দিয়ে আশ্চর্য দ্যোতনাময়। অবগুণ্ঠন টেনে তা যেন সব কিছুকে আরো গূঢ় অর্থে প্রকাশ করেছে।

আমার পরিচিত চারিদিকের দিকচিহ্ন এমন অর্ধবিলুপ্ত না হলে

তাদের সত্যকার বাস্তবতা এমন করে আমার কাছে ধরা পড়ত না বলে মনে হ'ল। অভ্যাসের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েই সব কিছুর অবহেলিত প্রচ্ছন্ন মর্ম উদ্ঘাটিত হয়েছে।

খালের মত সঙ্কীর্ণ যে নদীটি ঐতিহাসিক গৌরব হারিয়ে নগরের পয়োনালীর বদলী বেগার খাটে, তার বাষ্পাচ্ছন্ন ছায়ামূর্তি মানুষের বর্তমান বিশৃঙ্খল সভ্যতার নিগড়ে বন্দিনী সমস্ত নদীর ব্যথিত অভিযোগ ফুটিয়ে তুলে যেন নির্মলতার নীরব কান্না হয়ে উঠেছে। ওপারের যে বিষণ্ণ লোহিত প্রাকার বেষ্টিত বিরাট সব আয়তন প্রতিদিনে অতি পরিচয়ে তাদের উপস্থিতিটুকুও জ্ঞাপন করতে ভুলে যায় রক্তাভ অস্পষ্টতায় তারা শুধু একটা জেলখানা নয়, মানব সমাজের সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রতীক যেন হয়ে উঠল।

এসব হয়ত আমার অলস অলীক অসার কল্পনা মাত্র।

কিন্তু প্রখর দিবালোকই শুধু নয়, জীবন ও সৃষ্টির অনেক গূঢ় মর্ম সন্ধানে কুজ্ঝটিকার অন্তরালও যে পরম সহায় হয় মনের অযৌক্তিক ভ্রান্তি বলে এ ধারণা বাতিল করতে পারছি কই?

নারীর মধ্যে চিররহস্যমধুর নববধূকে আবিষ্কার করবার জন্যে যেমন তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই অবগুণ্ঠনই যথার্থ উন্মোচনের রহস্য কুঞ্চিকা কি নয়?

যা নিত্য পরিচিত তা অতি ঘনিষ্ঠতায় তার যে অর্থটুকু আমাদের সামনে মেলে রাখে তা নেহাৎ প্রয়োজনের সীমায় সঙ্কীর্ণ। তাকে তার সম্পূর্ণ সত্যে চেনবার জন্যেই আধেক ঢাকা প্রয়োজন।

শুধু আমাদের নগরের ওপরই নয় জীবনের অনেক কিছুর ওপরই এমনি ইঙ্গিতময় কুয়াশার আবরণ বুঝি মাঝে মাঝে পড়া দরকার।

অজান্তে আধুনিক কবিতারই বড় বেশী ওকালতি করে ফেললাম বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

নববধূর গুণ্ঠনের কথাটা উপমা হিসাবে উল্লেখ করার পর ভেবে দেখছি এই রীতি'ত শুধু আমাদের দেশে বা সমাজেই আবদ্ধ নয়। মানুষের মনের মধ্যেই এর অলক্ষ্য বীজ কোথাও আছে। যে দেশে নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন আব্রুহীন, সেই পাশ্চাত্ত্য দেশেও অন্তত পরিণয়ের এই একটি দিনে নববধূর যত সূক্ষ্মই হোক কুহেলিকার মত একটি ওড়না ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত বলেই জানি। বধূত্বের পরম রহস্য-মহিমা সার্থকভাবে প্রকাশের জন্যেই একটি সঙ্কেতময় আবরণ তাকে দেওয়া হয়।

ও দেশের বিবাহ অনুষ্ঠানের আর একটি আচারও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। যতদূর জানি বিবাহ অনুষ্ঠানের পর গির্জা থেকে নবদম্পতি বার হয়ে আসার সময় তাদের ওপর তণ্ডুলকণা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথা পশ্চিমের কোথাও কোথাও এখনো বর্তমান। জন্ম মৃত্যু বিবাহের মত মানুষের জীবনের পরম ঘটনার সঙ্গে যেসব বহু যুগের আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার জড়িত, অগ্রসর সভ্যতার যুক্তিবাদী সম্মার্জনীতেও তা ঝেড়ে ফেলা প্রায় অসাধ্য। এইসব সংস্কারের মধ্যে মানুষের সুদীর্ঘ বিবর্তনের অতীত আদিম সব পদচিহ্ন মিশে থাকে। আধুনিক মনের অবজ্ঞা বা উপহাস অগ্রাহ্য করেই প্রত্যেক দেশের দশকর্মের ভেতরে তা প্রকাশ পায়। বিবাহের অনুষ্ঠানে চাল ছড়াবার এই রীতি পাশ্চাত্ত্য জাতির কোনো বিলুপ্ত অধ্যায়ের ইঙ্গিতবহ কি নয়?

এ সংস্কারটি এই দিক দিয়ে রহস্যময় যে আজকের দিনে ধান্য শস্য পাশ্চাত্ত্য দেশের মোটেই অপরিচিত না হলেও শুনেছি এই শস্যটি ইতিহাসের বিচারে সেদিকে নবাগত। খাদ্যশস্য হিসেবে পশ্চিম প্রধানত গমের দেশ। যতদূর জানি আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলেই তার বন্য পূর্বপুরুষদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বা অন্য কোন আদি জন্মভূমি থেকে এই শস্যটি মিশরের

নীলনদীতটে বাৎসারিক বন্যার প্রসাদ পেয়ে সমস্ত পশ্চিমের কৃষি-জীবনের সূচনা করেছে। ধান্য শস্যের আদি জন্মস্থান কিন্তু পশ্চিমে নয় প্রাচ্যে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই সম্ভবত। এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে সমুদ্র পর্বত অরণ্য পার হয়ে সে শস্য বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল কি করে এবং কবে? এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ওদেশে থাক বা না থাক যেখানে যেটুকু তার অস্তিত্ব দেখা যায় তা প্রাচ্যের সঙ্গে কোনো বিলুপ্ত সম্পর্কের স্মৃতি কি ধরে রাখেনি? ধানদুর্বো না হোক ইওরোপের বর কনের মাথায় এসিয়ার তণ্ডুলকণা কোন সুবাদে গিয়ে বর্ষিত হয়?

বিজ্ঞানের কল্যাণে দুর্গমতা ও দূরত্ব বিজিত হয়ে পৃথিবী ছোট হওয়ার একটা উল্টো ফল হয়েছে এই যে দূর দুর্গম সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে যন্ত্রবিজ্ঞানের জয়-যাত্রার আগের যুগের পৃথিবী সম্বন্ধে। এখনকার সুগমতা আগেকার দুর্গমতার বিভীষিকা আমাদের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে। দু-মাসের পথ দুদণ্ডে যাই বলে আমাদের মনে হয় অরণ্য পর্বত সমুদ্রের বাধা বুঝি সে যুগে এমন অনতিক্রম্য ছিল যে নেহাৎ যুদ্ধ জয়ের অভিযান, তীরঘেঁষা সদাগরী সমুদ্রযাত্রা কি মরু প্রান্তরের কাফিলায় ছাড়া এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায় নড়ত না। দুস্তর বাধা তুচ্ছ করে তখনকার মানুষ কি অসাধ্য সাধন যে করেছে আমরা বেশীর ভাগই ভুলে যাই। নৌ-বিদ্যা আয়ত্ত হবার আগে শুধু ভেলায় ভেসেই মানুষ যে সমুদ্র পারে উপনিবেশের পত্তন করেছে, লোহার ব্যবহার না শিখেই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের বিশাল বিস্তৃতি শুধু নিরক্ষ ও হামবোল্ড স্রোতের সাহায্যে যে পশ্চিমের এসিয়া ও পূর্বের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জয় করেছে তা অনেক সময়ে নতুন করে হাতেনাতে প্রমাণ করবার জন্যে Thor Heyderdahl-এর মত

নৃতাত্ত্বিককে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শুধু দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের ভেলা অকূল সমুদ্রে ভাসাতে হয়, Erie De Bisschop-এর জ্ঞানোন্মাদকে পঁইষট্টি বৎসর বয়সে সেই চেষ্টায় প্রাণ দিতে হয়। শুধু সমুদ্র নয় অরণ্য পর্বত মরুর বাধাও যে সেই আদিম যুগেও মানুষ মানেনি পৃথিবীময় নানা নরগোষ্ঠীর আশ্চর্য মিশ্রণই তার সাক্ষ্য দেয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দরজায় বারবার বিদেশীর হানা দেওয়ার খবর আমরা যতটা রাখি এই পথেই ভারতের মানুষের নবদিগন্ত সন্ধানের নেশায় বার হওয়ার খবর বোধহয় ততটা নয়। সমস্ত ইওরোপ হয়ে ইংলণ্ড পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে যে-বেদেরা ছড়িয়ে আছে, তারা যুদ্ধবিগ্রহে নয়, একরকম অকারণ পুলকেই যে ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রথম প্রায় ছ'শ বছর আগে সূর্যাস্তের দেশে পাড়ি দিয়েছিল একথা স্মরণ করলে মানুষের রক্তের মধ্যেই চিরন্তন দুরন্ত অস্থিরতার আর একটা প্রমাণ পাই। মাত্র ছ'শ বছর আগে কেন, ইওরোপের মাটিতে ভারতবাসীর পদচিহ্ন আরো অনেক আগেই পড়েছে। পণ্ডিতদের কাছে শোনা দুটো দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৮৩৫-এ ইংলণ্ডের Cirencester-এ একটা সমাধি-শিলা আবিষ্কৃত হয়। সেটি খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর। তার লাটিন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, Dannicus Indiana নামে একজন বল্লমধারী সওয়ার সৈনিকের দুই রোম্যান বন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুসারে সে সমাধি শিলাটি স্থাপন করেন। Dannicus ভারতের লোক, রোমের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তাঁর সমাধি-শিলাটি দেখতেও নাকি দক্ষিণ ভারতের এই ধরণের খোদিত শিলাখণ্ডের মত। এ ছাড়া Julius Indus নামে আরেক সেনানায়কের নাম পাওয়া যায় তখনকার গল-এ। এঁরা ভারতীয় বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতবাসীর প্রাচীন উপনিবেশের প্রমাণও আছে।

ভারতের নামে বড়াই করতে এসব উদ্ভট খবর ঘাঁটাঘাঁটি করছি না, স্পুটনিক কি অ্যাটলাস ডি-তে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে মানুষ হঠাৎ সৃষ্টিছাড়া যে কিছু করে বসেনি, তার জৈব ইতিহাসেরই ধারা অনুসরণ করছে মাত্র, এইটুকু শুধু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

হই চই কিছু হয়নি। সংবাদপত্রেও খবরটা ওঠেনি। কিন্তু গত ১৯শে ফাল্গুন, শনিবার আমাদের একদিকে অবসন্ন অসাড় আর একদিকে অস্থির নির্বিকার এই শহর একবার না একবার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চমকে উঠে নিজের দিকে চেয়ে দেখেছে নিশ্চয়।

চমকটা খুব জোরালো হয়ত নয়। কয়েক মুহূর্ত বাদেই তা হয়ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ওপরে সব কিছু ছাপিয়ে না থাকলেও মনের নেপথ্যে সে চমকের রেশ সারাদিন থেকে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই ধুলো ধোঁয়ায় নোংরা অপরিচ্ছন্ন, চারিদিকের অসংখ্য কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত শহরে সেদিন হঠাৎ একটি মৃদু চমক যাঁদের লেগেছিল আমি তাঁদের একজন। সকালে রাস্তায় বেরিয়ে মনটা নাড়া খেয়ে উঠলেও তার কারণটা তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছিল কোথায় যেন কি একটা আশ্চর্য কিছু ঘটে গিয়ে আমার সব চিন্তা ভাবনার রংই বদলে দিয়েছে। এক একদিন বহুদূর থেকে সানাই-এর সুর শব্দ-সুরভিত বাতাসে ভেসে এসে মনটাকে এইরকম করে দেয় বুঝি।

১৯শে ফাল্গুনের সাড়াটা কিন্তু ধ্বনির রাজ্য থেকে নয়, রঙের জগৎ থেকে। কানের ভেতর দিয়ে নয় চোখের ভেতর দিয়ে তার স্পর্শ এসে পৌঁছোল ঈষৎ বিহ্বল বিস্মিত মনে।

ব্যাপারটা স্থূল গদ্যে বললে এই মাত্র—শহরের দেবদারু গাছ-গুলোর নতুন পাতা গজিয়েছে।

কিন্তু স্থূল গদ্য ছেড়ে সূক্ষ্ম পেলব পদ্যেও সেই পাতা গজানোর মৃদু বিস্ময় সম্পূর্ণ কি বোঝানো যায়?

ট্রামে বাসে গাড়িতে ট্যাক্সিতে বা পদব্রজে এই শহরে নিত্য
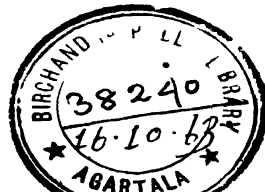
ঘোরাফেরার মধ্যে রাস্তার ধারের যে গাছগুলি সদাশয় পৌরকর্তারা নেহাৎ রেওয়াজ মাফিক বসাবার ব্যবস্থা করেছেন সেগুলির দিকে কচিৎ কদাচিৎ আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিনা সন্দেহ। ধুতির পাড়ের বেলা যেমন তেমনি ওগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতনই থাকি না। (শাড়ীর পাড়ের উপমা কিন্তু দিচ্ছি না।)

তারপর একদিন আমাদের ক্লান্ত ঔদাসীন্য ভেদ করে তাদের স্নিগ্ধ সম্ভাষণ মনে এসে পৌঁছোয়।

সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, লোভ আর দম্ভের নিষ্প্রাণ ষড়যন্ত্রে ইটকাঠ ধাতুপাথরের বেড়ায় যতই আমরা নিজেদের ঘিরে রাখবার চেষ্টা করি না কেন, ওই দেবদারু গাছগুলির মত আমাদের প্রাণ নিজের অগোচরে আর এক আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে ব্যাকুল।

ঠিক একই দিনে এক সঙ্গে সমস্ত দেবদারু গাছগুলির নব-পল্লবের শিহরণ হয়ত ওঠেনি। কিছু আগে পিছে হয়ত তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সমবেত উচ্ছ্বাস আমাদের গোচর হয়ে উঠল ওই তারিখটিতে।

নির্বাচনের হিড়িকে সমস্ত শহর পোস্টার প্যাম্ফলেট পতাকায় ছেয়ে যেতে ত কতবার দেখলাম। সেই সাময়িক উত্তেজনার ছিন্ন স্মৃতি অনাবশ্যক আবর্জনা হয়ে আজও নগরের পথঘাট দেয়াল শ্রীহীন করে রেখেছে।

জোর করে ফেনিয়ে তোলা সে মত্ততার দিনগুলি যদি মনে রাখবার মত হয়, তাহলে সমস্ত শহরের ওপর বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দে মেলান একটি স্নিগ্ধ আবেশ যেদিন ছড়িয়ে গেল সেই তারিখটিও স্মরণীয় হবে না কেন?

আমাদের এই কলকাতা শহরে শুধু দেবদারু নয় আরো অনেক

জাতের গাছই আছে। দেশদেশান্তর এমনকি সাগর পার থেকে সে সব গাছ বহু যত্নে আমদানি করা হয়েছে। কত জাতের গাছ যে আমাদের রাস্তাঘাটে স্নিগ্ধ সাহচর্য দেয় তার একটা তালিকা করতে গেলে বর্তমান জগতে গাছেদের আন্তর্জাতিক নাগরিকতার অনেক মজার খবর পাওয়া যাবে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি দেবদারুর প্রথম মৃদু সম্ভাষণ পেয়েছি, তারপর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপের দিন পর্যন্তও আরও বহু গাছের বিচিত্র নানা সম্ভাষণ পাওয়া যাবে। তাদের কেউ অচেনা মঞ্জরীর বর্ণবিস্ময়ে আমাদের উদাস বিহ্বল করতে চাইবে, কেউ চমকিত করতে চাইবে রঙীন চীৎকারের উল্লাসে।

ক্ষণেকের জন্যেও সচকিত চাঞ্চল্য এনে শহরের যান্ত্রিক মুষ্টি আমাদের মনের ওপর থেকে শিথিল করাই এইসব বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য ভাবতে ইচ্ছে করে। নিজের অগোচরেও এমনি একটি বাসনা নগর-বিন্যাসের মধ্যে হয়ত সর্বত্র প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আর একদিক দিয়ে মনে হয় এ যেন আমাদের নিরুপায় বন্দীত্ব মুক্তির ছলনায় মধুর করবার চেষ্টা। চিড়িয়াখানার লোহার খাঁচা উঠিয়ে দিয়ে নিরীহ বা হিংস্র সব প্রাণীকে কতকটা স্বাভাবিক পরিবেশে রাখবার যেমন ব্যবস্থা হয়।

ছেলেবেলা শহর ও গ্রামের তুলনামূলক প্রবন্ধ আমাদের কাকে না লিখতে হয়েছে। শহরের তুড়ে নিন্দে করে' গ্রামের নামে যত গদগদ হয়েছি, পরীক্ষায় নম্বরও আশা করেছি তত বেশী উঠবে।

শহর যেমনই হোক গ্রাম তখন আহা মরি কিছু নয়। পচা ডোবা, পানাপুকুর, ঝোপ ঝাড়, মশা ম্যালেরিয়ায় গ্রামের তখন অনেক দুর্দশা। কিন্তু মনের মোহ সে সব অপ্রীতিকর সত্য স্বীকার করতে দেয় নি।

গ্রাম ও শহর দুই-ই তারপর অনেক বদেলেছে ও বদলাচ্ছে।

গ্রাম সম্বন্ধে ছেলেবেলায় সে ভাবালুতার ঘোর এখনও কাটবার কোন কারণ না ঘটলেও শহরের দানবীয় কলেবর বৃদ্ধির বেগে ও বিশৃঙ্খলায় কেউ কেউ শঙ্কিত হয়ে উঠেছি বোধ হয়। শঙ্কিত হলেও নিরুপায় হয়ে বর্তমান যুগের একটা অপ্রতিরোধ্য শাস্তি হিসেবে শহরকে যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁরা হয়ত ভাবীকালের দুর্দশায় এ যুগের সান্ত্বনা খুঁজে মনকে এই বলে প্রবোধ দেন যে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন পঙ্গপালের মত বাড়বেই তখন যেটুকু সুখ-সুবিধা তাঁরা পেয়ে গেলেন ক্রমবর্ধমান মানুষের ভিড়ের ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসিতে সেটুকুও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল বলে। একজন সংখ্যাতাত্ত্বিক ত হিসেব কষে দেখিয়েই দিয়েছেন যে, এই হারে বাড়তে থাকলে একশ বছর পার না হতেই মানুষের সত্যি সত্যি আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না পৃথিবীতে। গ্রহান্তরে উপনিবেশ ততদিনে সম্ভব হবে কিনা জানি না, কিন্তু ডাঙার মাটি থেকে ঠেলা খেয়ে জলের ওপর ভাসানো ডেরা বেঁধেও মানুষ কুল পাবে না। জলে ডেরা বাঁধার মহড়া অবশ্য মানবজাতির হয়ে চীন অনেক আগে থাকতেই দিয়ে রেখেছে। সেখানে এমন অনেক পরিবার আছে বংশপরম্পরায় নৌকোই যাদের একমাত্র আশ্রয়। জন্ম মৃত্যু প্রেমের লীলা তাদের জলের ওপর ভেসেই চলে আসছে। এই অবস্থা হলে বিশ্বময় রাবণের গুষ্ঠির অন্ন যোগাবার যত ফন্দিই বিজ্ঞান বার করুক নূন আনতে পান্তা ফুরোবে বলেই সন্দেহ হয়। মাটির চাষ এখনই সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছেছে। তখন ডাঙার ঘাস পাতা ঝোপঝাড় আগাছা ত বটেই জলেরও পানা শ্যাওলা নল খাগড়া, অ্যালজি কেল্প প্ল্যাঙ্কটন কিছুই ফেলনা হবে না। বিজ্ঞানের কড়ায় সব কিছুর ঘণ্ট বানিয়ে তা থেকে খাদ্যসার ছেঁকে নকল খাবার তৈরী হবে। নকল ক্লোরোফিল এর মধ্যেই তৈরী হয়েছে। আণবিক গড়নপেটনে আসলের সঙ্গে হুবহু মিল থাকলেও শুধু সোনার কাঠির ছোঁয়াটুকুর

অভাবে তা এখনো অসাড়। ততদিনে নকল ক্লোরোফিল-এ সাড়া জাগাতে শিখে ধু ধু মরুতেও বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদের কাজ বকলমে সেরে জল হাওয়া রোদ থেকে খাদ্যমূল শ্বেতসার উৎপাদন করে তুলবেন। সমস্ত পৃথিবীময় মানুষের জগৎ অতিকায় উইঢিবি কি মৌচাকের মত নিরুপায় ঘনিষ্ঠতা ও নিরবকাশ ব্যস্ততার একটা নিরেট কারাদুর্গ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেকালের সবাই এ জীবনকে অসহ্য শাস্তি মনে করবে কি? বোধ হয় না। মানুষ শুধু সবকিছু সইবার শক্তিতে মহাশয় নয়, তার মানিয়ে নেবার ও মেনে নেবার ক্ষমতা যে কি অসীম তা সে নিজেও ভালো করে জানে না সবটাই শুধু ছাঁচে ঢালার ব্যাপার। মনটা গোড়াতে কি ছাঁচে ঢালা হয়েছে কি পরিবেশের ছাপ তাতে পড়েছে তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে,—আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা উদ্দীপনা। একাল থেকে সেকালের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার লোক যেমন চিরকাল থাকবে তেমনি নিজের কাল নিয়ে পরম পরিতৃপ্ত থাকবারও। দীর্ঘশ্বাস তারাই ফেলে যারা একাল ওকাল দুই-এর কোনটারই ছাঁচে পুরো ঢালাই না হতে পেরে না ঘরকা না ঘাটকা।

শুধু প্রগতিবিরোধিতা বা রক্ষণশীল গোঁড়ামির প্ররোচনায় নয়, যা মহৎ যা মধুর যা কল্যাণময় শুধু উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের নেশায় তা হেলায় ফেলে যাওয়ার মূঢ়তা ঠেকাবার আগ্রহে যুগে যুগে অনেক সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ নিরর্থক পরিবর্তনের স্রোতের বিরুদ্ধে সাহস করে অবশ্য দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে যাবার বদলে পিছিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেও প্রয়োজন হ'লে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। চীনের আদি দার্শনিক লাওৎসে নাকি ডাঙার গরুর গাড়ি আর জলের নৌকোও বাতিল করতে চেয়েছিলেন জনপদের সঙ্গে জনপদের যোগাযোগ দুঃসাধ্য করে তুলতে। আধুনিক সভ্যতার বেগমত্ত

মন নিয়ে লাওৎসের যুক্তি আমরা সত্যিই বুঝতে অক্ষম। যন্ত্রযুগের দুর্বার গতির সামনে আরও যাঁরা বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনেকের উৎসাহ ত আমাদের করুণামিশ্রিত কৌতুকই জাগায়। যেমন ইংলণ্ডে প্রথম রেলগাড়ি চালাবার সময় মাঠের গরু ভড়কে যাবে বলে যাঁরা পার্লামেণ্টে পর্যন্ত চড়াও হয়েছিলেন আজকের দুনিয়ার চেহারা দেখলে তাঁদের কি দশা হত ভেবে না হেসে পারা যায় না। না; এটুকু বুঝে নিয়েছি যে উচিত অনুচিত কোন যুক্তি দিয়েই, সত্য বা ভ্রান্ত কোন আদর্শের নামে যুঝেও পরিবর্তনের বন্যাবেগ ঠেকানো যাবে না, সব সময় সুস্থ প্রগতি তাকে বলি বা না বলি। সভ্যতার নিত্য স্ফীতিশীল অস্থির গতিপথের পাশে কিছু দীর্ঘশ্বাস যদি ছড়িয়ে থাকে ত থাকুক। ইতিহাসের রথচক্র তাতে থামবে না।

সে রথচক্র দুর্বার বেগে অজানা ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলুক। তার তাল রেখে বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে কি পদব্রজে লরী মোটরের ধাক্কা এড়াতে এড়াতে আমরা নগরের পথে নবপল্লবভূষিতা দেবদারুর বাৎসরিক প্রথম সলজ্জ সম্ভাষণ বারেক যে এখনো পাই তাতেই কৃতার্থ।

দেশের ভাগ্য যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের কেউ কেউ নাকি সেদিন সমুদ্রতীরের বিশ্রামাগারে বসে অবসর যাপনের জন্যে তাস খেলেছেন।

সংবাদটা চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নেই। চাঞ্চল্যটা কোথায় কি রকম হয়েছে তার সঠিক খবর রাখি না। জানি না এই তাস খেলাকে উপলক্ষ্য করে' ইতিহাসের কোন কুখ্যাত বেহালাবাদককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষার লাভাস্রোত কেউ কোথাও বইয়ে দিয়েছেন কি না।

দিয়ে থাকলে খুব বিস্মিত হ'ব না। কারণ সোজা জিনিস উল্টো করে দেখতে খণ্ডদৃষ্টিতে সমগ্রতার বিকৃত বিচার করতে আমাদের জুড়ি নেই।

সংবাদটা কারুর কারুর কাছে কিন্তু অন্য অর্থে চাঞ্চল্যকর। নিষ্প্রাণ পাথরের দেয়ালে হঠাৎ প্রাণের শিকড়ের ফাটল আবিষ্কার করার মত।

রাজশক্তি যাঁদের হাতে তাঁরা তুচ্ছ তাস নিয়ে মত্ত হতে পারেন এ খবরে স্তম্ভিত হওয়ার বদলে বিশেষ আশ্বস্ত হবার কিছু আছে বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। আশ্বস্ত এই জন্যে যে, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিছুকালের জন্যে যাঁরা হয়েছেন এই সামান্য তাস খেলার ভেতর দিয়ে আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের একটা মানবিক সম্বন্ধের সূত্র খুঁজে পাচ্ছি। দেশের পরিচালনায় এ মানবিক সম্বন্ধটুকুর দাম সবচেয়ে বেশী। কারণ এ সম্বন্ধটুকু থাকলে পরিচালনায় ভুলত্রুটি যাই হোক তা অন্তত অমানুষিক হবে না এই ভরসা একটু থাকে বোধ হয়। তাস যে খেলার বস্তু তা শিখলে তা দিয়ে তাসের ঘর বানাবার চেষ্টা অন্তত না হতে পারে।

রাজদণ্ড বস্তুটি বড় কঠিন অভিশাপে জড়ানো। সে দণ্ড ধরে থাকার অভ্যাস হাতের মুষ্টিকে এমন এক অনমনীয়তায় জমাট করে দেয় যে তা প্রীতির স্পর্শ নিতেও আর সহজে খুলতে চায় না। তাসের মত হাল্কা ক্ষীণ জিনিস নাড়াচাড়া করতে সে হাতের খিল কিছুটা নিশ্চয় ছাড়তে বাধ্য।

তাছাড়া তীরকে লক্ষ্যভেদের দুরন্ত বেগ যা দেয় সে ধনুকের ছিলা সব সময় টান করে বেঁধে রাখবার নয় তাকে টংকার ব্যগ্র করে তোলবার জন্যেই মাঝে মাঝে শিথিল হ'তে দিতে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিছু বাংলা ভাষায় চালাবার জন্যে একটা আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলন আজ হঠাৎ ওঠেনি, এর সূচনা হয়েছে অনেক আগেই এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম ঢেউ তুলেছেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাতৃভাষায় সব কিছু শিখবে এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হতে পারে! দেশবিদেশের নজির তার জন্যে দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্মগত অধিকারের দাবিই যথেষ্ট।

এ আন্দোলনের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও একটা আশঙ্কার ছায়া মন থেকে একেবারে সরাতে পারছি না। সে আশঙ্কা অন্ধ গোঁড়ামির। অন্ধ গোঁড়ামির ডালপালা মেলবার জন্যে এ জাতীয় আন্দোলনের মত উর্বর জমি আর নেই। জাতি, ভাষা, প্রদেশ ইত্যাদির ধুয়া পেলে এ গোঁড়ামি একেবারে দুর্বার হয়ে ওঠে।

যা শেখবার নিজের ভাষাতেই তা সহজে শিক্ষণীয় এ যুক্তি যেমন অকাট্য তেমনি এ সত্যও অস্বীকার করবার নয় যে, আজকের যুগের শিক্ষণীয় প্রায় সব কিছুই কোন বিশেষ ভাষার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিশেষ করে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তৃতি আন্তর্জাতিক। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যত গৌরবই থাক আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ আমরা পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকেই নিয়েছি। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যোগাযোগ রাখতে গেলে ভাষার না হোক পরিভাষার মিল আমাদের রাখতেই হবে। তা না রেখে যদি সব কিছুতেই কেঁচে গণ্ডুষ করতে চাই, তাহলে ব্যাপারটা হবে পাঁজার পোড়া ইট গুঁড়িয়ে নতুন করে ছাঁচে ফেলার মত হাস্যকর বাতুলতা। অন্ধ গোঁড়ামির মধ্যে এই বাতুলতাই সব চেয়ে প্রকট। বাংলা ভাষার নামে শপথ নিয়ে তা চেয়ারের বদলে আমাদের কেদারায়

বসাতে চেয়েই ক্ষান্ত হবে না পুলিসকে আরক্ষী করে তুলে অক্সিজেনকে অক্ষজন বা তার চেয়েও বিদঘুটে কিছু বলতে রাজী না হ'লে কোতলের ব্যবস্থা করবে।

বিদেশীর অধীন যে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের একদা থাকতে হয়েছিল সে লজ্জা নগর থেকে তাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তর মূর্তিগুলি হটিয়ে দিলে ঘোচে কি না জানি না কিন্তু তাদের কাছে মূল্যবান যা পেয়েছি শুধু নাম পাল্টে দিলেই তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকার দায় চুকে যায় না। বাতাস থেকে অক্সিজেন পৃথক করে' তার গুণাগুণ প্রথম বিশ্লেষণ আমরা করিনি। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের নানা শাখাতেই গোড়াপত্তনের কাজে আমাদের হাত লাগাবার সুযোগ ছিল না। বিজ্ঞানের হালের মূলধনে তাই পাশ্চাত্ত্য ট্যাঁকশালের ছাপ। তাতে দুঃখ বা লজ্জা পাবার কিছু নেই, রাগ করবারও। সার কথা যদি বুঝি তাহলে তা এই যে সাহিত্যশিল্প জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশ ওদেশ কারুর নয়, তা চিরকালের সমস্ত মানুষের। যেখানে যে যা দিচ্ছে সব জমা হচ্ছে সর্বজনীন ভাঁড়ারে। কয়েক শতাব্দী আমরা চাঁদা কিছু যদি না দিতে পেরে থাকি, এখন দিচ্ছি ও ভবিষ্যতে দেব। এককালে মনে রাখবার মত কিছু দিয়েছিও। আর সব কিছুর কথা বাদ দিয়ে শুধু শূন্য যা দিয়েছি তার ওপর সভ্যতার জটিল বিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে। দেওয়া নেওয়ার এই হিসাবই আসলে নিরর্থক। দেওয়ার দম্ভ যেমন অসার নেওয়ার সঙ্কোচও তেমনি যুক্তিহীন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মত এ যুগের যা চলতি মুদ্রা তার বিশ্বজনীন ব্যবহারের সুযোগ না নিয়ে তা অকারণে নিজের ভাষায় গলিয়ে ঢালা মূঢ়তার চরম ছাড়া কিছু নয়। বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে বদ্ধ গোঁড়ারা সেই পথেই না আমাদের টেনে নিয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দি সাহিত্যে উর্দুর ছোঁয়াচ থেকে শুদ্ধ করার শুচিবাইগ্রস্তেরা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ কিভাবে রোধ

করতে মত্ত তা দেখছি। বাংলায় তাদের ধর্মভাইদের সম্বন্ধে গোড়া থেকেই তাই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বহুকাল আগে স্বদেশী যুগের আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা একটি নাটক পড়েছিলাম মনে আছে। তাতে একটি দৃশ্যের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে যে প্রচণ্ড করতালির তুফান উঠত তা স্বকর্ণে শোনবার সৌভাগ্য না হলেও অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারি। দৃশ্যটি যতদূর মনে পড়ছে এই রকম ঃ—বিদেশী বর্জন সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর আশ্রিতা একটি ঈষৎ জড়বুদ্ধি ছোট মেয়ের কথায় অকস্মাৎ চৈতন্যলাভ করে স্বদেশী ব্রতের মর্ম বুঝলেন। সেই ছোট মেয়েটি বাজার থেকে, বাড়ির পরিচারিকা বিলিতি বেগুন কিনে এনেছে বলে একেবারে কেঁদে-কেটে আকুল। তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েই কোন একজন ক্ষুদে প্রচারক উক্ত সংশয়ীকে চরম লজ্জা দিলেন। মূঢ় অবোধ একটা ছোট মেয়ে শুধু বিলিতি শব্দটা বেগুনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যদি এমন বিক্ষুব্ধ অস্থির হতে পারে, তাহলে তাঁর কর্তব্য যে কি তা বুঝতে ভদ্রলোকের আর বিলম্ব হল না।

সামান্য একটা কথার ইঙ্গিতে জীবনের মোড় একেবারে ফিরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয় নিশ্চয়ই। কিংবদন্তীতে ও ভাবালু নাটকে তা বেশ উপভোগ্যই হয়। 'বেলা গেল বাসনা ফেলবি না?' এই কথা কটির গূঢ় ইঙ্গিতে বিষয়মদে মত্ত কে কবে এক বস্ত্রে সংসার ছেড়ে চলে গেছে শুনতে সময় বিশেষে আমাদের ভালোই লাগে।

কিন্তু ওই মূঢ় অবোধ মেয়েটির বাতুল বিক্ষোভকে নাটকীয় মহিমা দেবার চেষ্টায় কি একটা অস্বস্তিবোধ করেছিলাম নাটকটি সেই প্রথম পড়বার সময়েই। কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে স্বদেশীয়ানাকে শুধু বাহ্যিক মূঢ় ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই দেখবার চেষ্টা হচ্ছে।

এতদিন বাদে বাংলা ইংরাজি হিন্দির স্বপক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনাময় তর্ক-বিতর্ক শুনে সেই অস্বস্তি ও সন্দেহই আবার জাগছে।

বাংলাভাষাকে যুক্তিযুক্তভাবে শিক্ষার বাহন অবশ্যই করা উচিত কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজিকে যাঁরা পায়ে ঠেলতে চাইছেন তাঁরা যেন সেই মূঢ় বালিকার বিলিতি-বেগুন-মার্কা বিচারবুদ্ধিই এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন।

আজকের দিনে একদিকে যেমন দেশ আরেকদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে যোগ আমাদের না রাখলে নয়। পাশ্চাত্ত্য যে সব দেশ বহুকাল ধরে স্বাধীন ও যে দেশে স্থানীয় নিজস্ব ভাষা যথেষ্ট অগ্রসর, সেখানেও অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা একাধিক ভাষা স্বেচ্ছায় শিখে থাকে। নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষা বাদে বিশ্বের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভাববিনিময়ের জন্যে আরেকটি পাশ্চাত্ত্য ভাষার ওপর দখল আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সে হিসাবে ইংরাজির চেয়ে সব দিক দিয়ে এমন উপযোগী বিদেশীভাষা আমরা পাচ্ছি কোথায়? বিশেষ করে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সে ভাষার প্রবাহের খাত সমস্ত দেশময় এখনো যখন খনন করাই রয়েছে। পরাধীনতার তিক্ত স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত বলে আজ যদি এ ভাষাকে অস্পৃশ্য করতে চাই তাহলে আজকের দিনের স্বাধীনতাকেই ছোট ও তুচ্ছ করা হবে। ইংরেজের অধীন থাকবার সময় ইংরাজি বর্জনের অভিলাষের যদি বা কিছু যৌক্তিকতা ছিল, আজ তা নেই। অধীনতার শাপে আমাদের একটি বর হয়েছে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত এই ইংরাজি ভাষার বাতায়ন। আর যেখানে যা হয় হোক ভারতবর্ষের এ যুগের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বাতায়ন যেন খণ্ডদৃষ্টির মূঢ়তায় রুদ্ধ না হয়।

গরম পড়ার সরকারী তারিখটা ঠিক জানি না, কিন্তু ট্রামের পাখা দেখে বুঝলাম সে তারিখ এসে গেছে। গরমটা অবশ্য সরকার তারিখ জেনে কি ট্রামের পাখা ঘুরতে দেখে বোঝবার দরকার হয় না। আকাশে বাতাসে শরীরে মনে তার বার্তা আপনা থেকেই আসে।

সকলের কথা জানি না, কিন্তু আমার মত কারুর কারুর কাছে এই প্রথম গরমপড়ার একটি বিশেষ স্বাদ বোধহয় আছে। কুয়াশার দিন গত, দেবদারুর পর আরো অনেক গাছ নতুন পল্লবের সাজ ধূলোয় ধোঁয়ায় মলিন করে ফেললো। সেদিন শহরের একটি রাস্তায় শিমুলের রক্তিম কটাক্ষ দেখেছি, নির্লজ্জ কামনার উগ্রতার সঙ্গে নিষ্পাপ সারল্য যেন মেশানো।

শুধু এ সব নয় শরীরে মনে একটি ঈষৎ দাহ মিশ্রিত অবসাদের অস্ফুট অনুভূতিই গ্রীষ্মের প্রথম সূচনাকে চিহ্নিত করে দেয়।

এই গ্রীষ্ম পরে যে রুদ্ররূপ নেবেন তার কথা যথাসময়ে ভাবা যাবে। কিন্তু আপাতত এই নাতিউষ্ণ আবহাওয়ার স্বাদটুকু উপেক্ষা করবার নয়।

এ স্বাদকে ঠিক মধুর বলব না, শীতের শেষের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর বদলে অল্পবিস্তর শারীরিক অস্বস্তিই এর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু সেই সঙ্গে অবসাদের যে আভাসটুকু আছে নিতান্ত বিবেকপীড়িত কর্তব্যপরায়ণ না হলে তা উপভোগ্য।

গা এলিয়ে দিয়ে একটু অলস হবার, কাজে একটু-আধটু শৈথিল্য করবার কুমন্ত্রণা যেন প্রকৃতিই কানে কানে এসময়ে আমাদের দেয়। যারা সে মন্ত্রণায় ভোলে না তারা মহৎ কিন্তু যাদের মনোবল অত বিপুল নয় তাদেরও খুব দোষ দিতে পারি কি?

জাতীয় চরিত্র গঠনে আবহাওয়ার দান নিয়ে পণ্ডিতেরা কতদূর গবেষণা করেছেন জানি না, তবে শুধু আমাদের মত দু'চারজন দুর্বলচিত্তের কানে নয়, উষ্ণমণ্ডলের সমস্ত দেশের কানেই প্রকৃতি এই একটু গা এলাবার মন্ত্রণা দেয় বলেই মনে হয়।

দেশের সামনে আমাদের অনেক কাজ। সে কাজে গাফিলি করবার ওকালতি অবশ্যই করছি না। কিন্তু পৃথিবীময় বড় বড় দেশ ও রাষ্ট্রের অবিরাম ঊর্দ্ধশ্বাস দৌড়ঝাঁপ দেখে এক এক সময়ে ক্ষীণ একটা সংশয় মনে যে জাগে তা অস্বীকার করতে পারব না। ধরণীকে সুজলা সুফলা করতে, অন্নবস্ত্রের অভাব মিটিয়ে মানুষকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ নীরোগ করতে, যা খাটবার খাটতেই হবে, কিন্তু ছোটার নেশায় লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়ার মত কাজের উন্মাদনায় ছুটির মানে ভুলে যাওয়ার বিপদ কি কোথাও উঁকি দিচ্ছে না? ঘণ্টা ধরা কাজ ও ছুটির হিসাব করছি না। হপ্তায় পাঁচদিন কাজ করে দুদিন যে দেশে ছুটি মেলে সেখানেও ছুটিটা ঠিক অহেতুক আলস্যে এলানো নয়, কাজের চাকাতেই যেন বাঁধা। হয়ত সেটাই সঙ্গত। পৃথিবীজোড়া কাজের চাকা যেদিন মসৃণভাবে আবর্তিত হবে সমস্ত মানুষের জীবনকে জড়িয়ে সেইদিনই সম্ভবত মানব সভ্যতার পরম সার্থকতা। তবু নিজের চরিত্র-দোষেই হয়ত, কখনো কখনো মনে হয় প্রথম গ্রীষ্মের নাতিতপ্ত বাতাসে আমাদের মত দেশে প্রকৃতির যে কুমন্ত্রণা আছে তা শুনে ঊর্দ্ধশ্বাস ব্যস্ততার মাঝে একটু আধটু আনমনা হবার অবসর রাখলে সভ্যতার খুব বেশী লোকসান বোধহয় হ'ত না।

কলকাতায় বাসা পাওয়াই ভাগ্য, তার ওপর একটু জমি পাওয়া ত কল্পনাতীত। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই বিরল সৌভাগ্যেরই অধিকারী।

কলকাতায় তাঁর ছোটখাট একটা বাড়ি আছে আর দু-চারটে গাছপালা লাগাবার মত জায়গা তিনি বাড়ির সঙ্গে পেয়েছেন।

কিন্তু এই সৌভাগ্য যেভাবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন অনেকেরই তা মনঃপূত বোধ হয় হবে না। তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং রুচি ও শখের অভাবে কেউ যদি রীতিমত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হন তাতেও দোষ ধরবার কিছু নেই। কারণ সত্যিই কলকাতার মত শহরে এই দুর্লভ সুযোগটুকু পেয়েও তিনি না করেছেন ভালো করে ফুলের বাগান না তরিতরকারীর চাষ। জায়গাটা একরকম এলোমেলো জঙ্গলই তিনি করে রেখেছেন।

ফুল গাছ সেখানে নেই এমন নয়; কিন্তু সে এমন গাছ যার নাম জানতেও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গাছের বদলে লতাই তাকে বলা উচিত। কিন্তু লতিয়ে ওঠার ভঙ্গিটুকু ছাড়া লতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে কোন দিক দিয়েই তা মেলে না। অসহায়তা পেলবতা কমনীয়তার ধার সে ধারে না। বন্য দুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাবল্যে তরু শ্রেণীকে লজ্জা দিয়ে একটু প্রশ্রয় দিলেই তেতালার ছাদ পর্যন্ত সবুজের বন্যাতরঙ্গে প্লাবিত করে দেয়। বছরে একবার চৈত্রের শেষে সে কখনো কখনো যুঁই-এর মত ছোট শাদা ফুলের সমারোহ আনে বটে, কিন্তু সেও যেন তার নিজের খেয়াল খুশিতে। সে ফুলের চেহারা ও গন্ধে সাধারণ রসিকজনের মন ভোলবার নয়। মিষ্টতার চেয়ে সে সুবাসে বন্য অপরিচিত অস্বস্তিকর একটা কি যেন আছে।

আমার পরিচিত গৃহস্থবন্ধু মাঝে মাঝে এ লতাটিকে শাসন করতে বাধ্য হন, বিশেষ করে উৎসাহের আতিশয্যে ও প্রাণোচ্ছলতায় যখন তাঁর বাড়িটিকেই সে বাতিল করতে উদ্যত হয়। লতাটি কিন্তু কোনো আরণ্য দেবতার বরে অজর অমর। গোড়া পর্যন্ত কেটে ফেলবার পরও দেখা যায় পরের বছর সমান উৎসাহে নবীন মেঘের মত পত্রপুঞ্জ মেলে সেই ত্রিতল শিখরের দিকে সে অসংখ্য বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করছে।

এই অবাধ্য অপ্রয়োজনীয় বন্য লতার একেবারে মূলোচ্ছেদ করে সব জ্বালা শেষ করে দেওয়া যায়। বন্ধু যে তা পারেন না সে তাঁর দুর্বোধ এক দুর্বলতা।

এই দুর্বলতার চেয়ে বিস্ময়কর আর একটি নির্বুদ্ধিতা তাঁর ওই বাগানেই নাতিবৃহৎ একটি আম গাছে মূর্ত হয়ে আছে।

আম গাছটি বছর আষ্টেক ধরে তাঁর বাড়িতে দেখছি। চরিত্রভ্রষ্ট করে তাকে লতাধর্মী করবার চেষ্টাই প্রথম দিকে হয়েছিল জাপানী উদ্যানের কিংবদন্তী শুনে।

আম গাছটি কিন্তু বৃক্ষত্ব বর্জন করে লতা হয়ে উঠতে পারেনি। স্বভাব ও দীক্ষার দ্বন্দ্বে দোমনা হয়ে সে বরং সব কাজের বার হয়ে গেছে। তার দুর্বল শীর্ণ কাণ্ডে ও ডালপালায় তরুর দৃঢ়তা নেই আবার লতার পেলবতাও নয়। মাঝে থেকে তার নিজের জীবনধর্মই সে গেছে ভুলে। প্রতি বছর বসন্ত সমাগমে নধর সবুজ নব পত্রের শোভা কয়েক দিনের জন্যে তার অঙ্গে দেখা যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। নতুন কচি পাতার আশ্বাস নব মুকুলে আর সার্থক হয় না। মুকুল ধরাবার কোন তাগিদই তার যেন নেই।

নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া এ আম গাছটি লালন করার কি হেতু থাকতে পারে বুঝতে না পেরে একদিন বন্ধুকে সোজাসুজি প্রশ্নটা করে ফেললাম।

তিনি একটু চুপ করে থেকে সকৌতুকে বললেন, আপনারা আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের জগতের মানুষ হয়েও আমার বাগানের মর্ম বুঝলেন না! আশ্চর্য।

একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বললাম, আধুনিক শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে আপনার বাগানের সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ কিছু নেই, কিন্তু মিল আছে। তিনি হেসে বললেন, আম গাছের অর্থটা তার আম ফলানোর সঙ্গেই জড়িত। সেই অর্থটাকেই ছেঁটে বাদ দিয়ে ও আম গাছ আরেক বিশুদ্ধ তাৎপর্য পেয়েছে আমার বাগানে।

এ ত সস্তা হেঁয়ালি হ'ল মাত্র! অধৈর্যের সঙ্গে বললাম।

সস্তা কি না জানি না, কিন্তু হেঁয়ালি নিশ্চয়! বন্ধু জবাব দিলেন, আর এই হেঁয়ালি দিয়ে ছাড়া শিল্পচেতনা থেকে জীবনের নোংরা স্থূল স্পর্শের ছাপ ধুয়ে মুছে সাফ করা যায় না।

জীবনের ছাপ ধুয়ে মুছে সাফ করবই বা কেন?

কেন তা আপনাদের যুগকেই জিজ্ঞাসা করুন।—বলে তিনি হেসে উঠলেন। আমাকেও হাসতে হ'ল বোকা বলে ধরা পড়বার ভয়ে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম, নিস্ফলা আম গাছের বিশুদ্ধ তাৎপর্য না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওই বুনো বাজে লতাটা নির্মূল করেন না কেন!

ওটার মধ্যে নিরর্থকতার সাধনা আছে আর তার চেয়ে বেশি আছে বন্যতার স্মারক-সঙ্কেত।

আমায় বিমূঢ় বিহ্বল দেখে তিনি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যেই বললেন, আমাদের বাগানে যেসব ফুলগাছ থাকে, তা শুধু পোষ মানানো নয়, তার সৌন্দর্যও আমাদের মনের মাপে সৃষ্টি করা ও সাজানো। কিন্তু ওই নাম না জানা বন্য লতা আমার মনের

ফরমাশের ধার ধারে না। ওর উদ্ধত অবাধ্যতার মধ্যে তাই উদ্দেশ্যহীন আনন্দের স্বাদ পাই, আর পাই ভয়ঙ্কর দুর্বার সেই বন্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেবার ইঙ্গিত, পাহারা একটু শিথিল করলেই যে বন্যতা আমাদের সমস্ত সভ্যতা সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করে ঢেকে দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

আপনার ওই বন্য লতার মতই যুক্তি ও কথাগুলো কেমন ডালপালায় জট পাকিয়ে গেল না? বন্ধুর চোখের কৌতুক-কুঞ্চনে ভরসা পেয়ে বললাম।

যুক্তি আঁকড়ে থাকাটাই যে কোথাও কোথাও কুসংস্কার, তা এখনো বুঝলেন না? বলে বন্ধু সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

নিজের কুড়েমি অক্ষমতা আর কুরুচির খুব মজার হেঁয়ালি সাফাই তৈরি করেছেন বটে! শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে বন্ধুকে শুনিয়ে এসেছি।

বাড়িতে ফিরে কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে বন্ধুর সাফাইটা নিছক নির্দোষ কৌতুক, প্রচ্ছন্ন হুল ফোটানো পরিহাস, না আর কিছু!

হেঁয়ালি রসিকতা করতে গিয়ে নিজেরও অজান্তে গহন কিছুর স্ফুলিঙ্গ তাঁর কথায় চমকে উঠেছে কি?

আধুনিক এক সমালোচনার কেরামতি দেখে সম্প্রতি চমৎকৃত স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েছি। সমালোচনার এ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সব কিছুর চেহারা অর্থ ইঙ্গিত একেবারে আমূল বদলে যায়। হঠাৎ বুঝতে পারা যায়, এতদিন ধরে যা বুঝে এসেছি, তা ভুল। নতুন করে বুঝি যে, বনের পাখি দেখে বা তার কলকাকলি শুনে মুগ্ধ হ'তে গেলে তার বাসার ডিমটা ভেঙে না ঘাঁটাঘাঁটি করলে নয়।

এ সমালোচনার একটা নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটাই ধরা যাক। এ ছড়া আমরা অনেক পুরুষ ধরে সারা জীবন শুনে আসছি। কিন্তু এর আসল অর্থ ও ইঙ্গিত কিছুই বুঝিনি। অনুমান করতেও পারিনি এর মধ্যে কি গভীর ভয়াল জীবনরহস্য লুকিয়ে আছে। ছড়াটিতে সামান্য বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর-এর পরই যে নদীতে বান আসে তার কারণ প্রচ্ছন্ন প্রবল মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। ফুট নোটে এ কথার সমর্থনে অন্তত সাতটি মহাপণ্ডিত ও তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম দিতে পারি। ছাপার ভুল হবার ভয়ে দিলাম না, কারণ নামগুলি Sandor Ferenczi, Sigmund Freud জাতীয়।

নদীতে বান ডাকাবার মৃত্যু ইচ্ছা (যার আরো গালভরা নাম অনায়াসে দেওয়া যায়) তার পরের ছত্রে কোথায় না যাচ্ছে! 'শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান'-এর মধ্যে লিবিডো ফ্যালিক সিম্বল থেকে ইডিপাস কমপ্লেক্স পর্যন্ত অনেক কিছুই তেমন মনঃসমীক্ষা বিশারদ সমালোচক-ডুবুরী নামালেই পাওয়া যেতে কতক্ষণ? শেষ কটি ছত্র ত একেবারে কমপ্লেক্সের কাঁটায় গিজ গিজ করছে। 'এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান, এক কন্যে পেলেন নাক'

বাপের বাড়ি যান'-এর মধ্যে পিতৃপ্রতীক, আদিম অপরাধ-বোধ থেকে গোটা মনঃসমীক্ষার শাস্ত্রই বর্তমান।

এই অপরূপ নতুন সমালোচনা চল্লিশ বছর আগেকার বিদেশী হিংটিং ছটের নকল বলে হেয় করবার চেষ্টা কেউ যেন না করেন। ওকরম অনেক নতুন হুজুকেরই কুলজি নিয়ে তাহলে টান পড়বে। সম্প্রতি বাংলা দেশের শ্রদ্ধেয় সর্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের একজন এই সমালোচনার খর্পরে পড়েছেন বলেই একটু ভাবিত হচ্ছি। নিজের সার্থকতম রচনাগুলির এই সাংঘাতিক বিশ্লেষণ দেখবার পর লজ্জায় ঘৃণায় আর তাঁর কলম সরতে চাইবে কি ?

সাহিত্য-সমালোচনার যে আজব নমুনা সম্প্রতি দেখেছি তাই থেকে উল্টো আর সোজা তর্কের কিংবা বলা যায়, এগিয়ে যাওয়া আর পিছু হাঁটা ভাবনার কিছু মজার উদহরণের কথা মনে পড়ে গেল। গত যুগের অদ্বিতীয় ব্যঙ্গ-রসিক এক ইংরাজ লেখক সামনে চলা আর পিছনে-নামা চিন্তার তফাৎ বোঝাতে এই রকম মজার একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মনে পড়ছে।

তাঁর মতে চিন্তা ভাবনা যুক্তি দুরকমের হয়। উচ্ছ্বাস অত্যুক্তির অযৌক্তিক বাগ-বিস্তারের ভেতর দিয়েও এক ধারা সামনের দিকে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে, কিন্তু যুক্তি-শৃঙ্খলার ভড়ং নিয়েও আর এক ধারা পিছু সরতে সরতে অর্থহীনতার শুষ্ক মরুতেই লুপ্ত হয়।

তাঁর দেওয়া নমুনা যতদূর মনে পড়ছে, কতকটা এই রকম ঃ—

বিশুদ্ধ বস্তুবাদী আধুনিক তাত্ত্বিকের সামনে উনুনের আঁচ উস্কে দেবার বাঁকা শিক, কোথাও পড়েছে। সে শিক দেখে তাঁর প্রথম উক্তি হ'ল,—আহা বেচারা বাঁকা শিক !

তাঁকে সবিনয়ে হয়ত বলা হল যে পৃথিবীতে আগুন নামে একটি আশ্চর্য বস্তু আছে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদ্যাশক্তি স্বরূপ রহস্যভয়াল

ব্যাপারও তাকে বলা যায়। এই ব্যাপারটিকে সামান্য উনুনের বেষ্টনী দিয়ে বশ মানাবার কাজে লাগে বলে শিক বাঁকা হয়।

তত্ত্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ রায় দিলেন,—তাহলে শিক যাতে না বাঁকে সে জন্যে আগুন বাতিল করা হোক।

বাঁকার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিরূপতা ও সোজার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতিতে এ রায় খুব বেশী মনে ধরলেও কাতরভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা না করে পারা গেল না যে আগুন নামে ওই বস্তু বা ব্যাপারটি না হলে মানুষের চলে না। মানুষের সভ্যতা এক হিসেবে ওই আগুনের আঁচেই শুরু হয়েছে।

বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী তত্ত্বজ্ঞ খানিক কি ভাবলেন। তারপরে দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, আগুনের মত সাংঘাতিক সর্বনাশা জিনিস নিয়ে খেলা না করলে যার সভ্যতাই লোপ পায় সেই প্রাণীটির টিঁকে থাকবার কোন দাবী আছে বলে মনে হয় না। মানুষের মত এ রকম আজগুবী গোলমেলে জটিল জীবকে জীইয়ে রাখার চেয়ে শিক-এর সরলতা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়।

তর্কের নমুনাটি নিতান্ত হাস্যকর উৎকট আতিশয্যে ভরা সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তিবাদের নামে শাঁস ছেড়ে ছোবড়া নিয়ে অনেক বিষয়েই আমরা টানাটানি কি সত্যিই করি না, বিচার করতে বসে লেজুড়কেই পরম জ্ঞান করে ধড়মুণ্ড দিই না উড়িয়ে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন নিয়ে যে বিবাদ চলেছে, তাতেই ত মনে হচ্ছে, উনুনের শিক সোজা করার উৎসাহে আগুনটাই নিবল কি না সে বিষয়ে কারুর কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাহন নিয়ে অন্ধ গোঁড়ামির বাড়াবাড়িতে সওয়ারীকেই খানায় ফেলা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আমরা যেন বেহুঁশ।

বানানে আমি চিরকাল মাটো। হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান ত কমই, ষত্ব ণত্বও রীতিমত ফ্যাসাদে ফেলে। 'পাশ্চাত্ত্য'-এ ত এর দ্বিত্ব অনেক-কাল অজানা ছিল, দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় ব ফলা নিয়ে বহু পূর্বে এক প্রকাশকের সঙ্গে সত্যিকার হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল, এবং কুজ্ঝটিকার আসল বানান আমার কাছে বহুদিন শব্দানুসারী হ্ব-এর আড়ালে অস্পষ্ট থেকে গেছে।

আমার মত বানান-বিশারদ খুব বেশী আছেন বলে আমি মনে করি না। নিজের এ অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করে কিছু লিখতে হলে অসঙ্কোচে আমি অভিধান নিয়ে বসি। শুনছি ইংরাজি ভাষাও শব্দানুসারী অক্ষরে শিক্ষা দেবার পরীক্ষা শুরু হয়েছে, বংলা ভাষার সে রকম কোনো বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্প্রতি যখন নেই তখন আমাদের জীবনে লেখার বাতিক না ছাড়তে পারলে অভিধানকে নিত্যসঙ্গী করতেই হবে।

হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ-র এক সমস্যায় পড়ে অভিধানের শরণ নিতে নিতে এইমাত্র একটা কথা মনে হ'ল।

আমাদের বাংলা অভিধানে উচ্চারণ দেওয়া থাকে না কেন?

বাংলা ভাষার উচ্চারণে ইংরাজির মত অত গণ্ডগোল অবশ্য নেই। কিন্তু যতদূর জানি জার্মানের মত দ্বিধাহীন উচ্চারণ পদ্ধতিও তার অক্ষরে নিহিত নয়।

অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অভিধান মূলত সেই ভাষাভাষীদের জন্যেই গ্রথিত হলেও সেখানে যদি উচ্চারণের ইঙ্গিত দেওয়া থাকতে পারে তাহলে বাংলা অভিধানেও তা থাকতে দোষ কি?

বাংলা ভাষায় কয়েকটি উচ্চারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় নির্দেশ দেওয়া

হয়ত সম্ভব নয়। যেমন মন বন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ অকার দিয়ে উচ্চারিত হবে না, তাতে একটু ওকারের ছোঁয়া থাকবে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। যেখানে এরকম দ্বিধা সেখানে বিকল্প উচ্চারণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু খেলা কি ঢেলা জাতীয় শব্দের উচ্চারণে শুদ্ধ একার যে এলায়িত সে নির্দেশটুকু থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সমস্ত শব্দের না হোক যেগুলির উচ্চারণে আক্ষরিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় সেগুলি সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই ব্যতিক্রম শব্দটাই ধরা যাক। ব্যতিক্রম শব্দের ব্য-এর উচ্চারণে একারের একটু এলায়িত ছোঁয়া শিক্ষিত সমাজে চালু। আবার ব্যবহার আর ব্যাকরণের ব্য ও ব্যা-র উচ্চারণের বিশেষ তফাৎ নেই। অভিধানে এই সব উচ্চারণ সমস্যা মীমাংসার ইঙ্গিত কেনই বা থাকবে না!

অনেক শব্দের উচ্চারণ এখনো তর্কাতীত হয়ত নয়। কিন্তু উচ্চারণের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা রচনার চেষ্টা এখন থেকেই হওয়া উচিত মনে হয়।

ইংরাজি উচ্চারণের ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজের আধিপত্য এখন বি-বি-সিতে অনেকখানি অর্সেছে বলা যায়। উচ্চারণের একটি শুদ্ধ সংস্কৃত বিদগ্ধ ধারা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্যে এ প্রতিষ্ঠান সদা সচেষ্ট। আমাদের বাংলা বেতার কেন্দ্র এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে সচেতন কোনো আয়োজন সেখানে হয়েছে বলে জানি না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থান থেকে আঞ্চলিক উচ্চারণের ক্রম-পার্থক্য সব দেশের ভাষাতেই দেখা যায়। এককালে নদীয়া শান্তিপুরের এদিক দিয়ে যে প্রাধান্য ছিল আজ কলকাতার বিদ্বৎ সমাজ তা লাভ করেছেন বললে ভুল হয় না।

আকস্মিক দেশ বিভাগের ফলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মাঝে সেই নগর-কেন্দ্রেও যে উচ্চারণ বিভ্রাটের সূত্রপাত হয়েছে তা নিবারণের জন্যে আভিধানিক নির্দেশের কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

রোজ বিকেলে আমার মত অনেকেই বোধ হয় আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। তাকিয়ে হতাশ হচ্ছেন। কোথায় সে আকাশের প্রান্ত ছিঁড়ে হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে হানা দেওয়া হস্তী-যূথের মত কালো মেঘের দঙ্গল, কোথায় কালবৈশাখী! আকাশ যেন ওসব বন্য উদ্দামতা ভুলে গিয়ে শান্ত সংযত শহুরে নির্জীব হয়ে গেছে। কলকাতার শহর গঙ্গা পেরিয়ে ও গঙ্গার দুই তীর ধরে কারখানার ধূমল বন্ধ্যাত্ব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে। দুরন্ত মেঘের পাল-কে প্রলুব্ধ করবার মত অরণ্যভূমি আর নেই বললেই হয়। কালবৈশাখী তাই বুঝি দুর্লভ হয়ে এল। দারুণ তাপদাহের সে উত্তেজনা-স্পন্দিত শান্তির বদলে আছে বটে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের নিরবচ্ছিন্ন আরাম ভাগ্যবানদের জন্যে। কিন্তু সে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে, তপ্ত দিনের দুঃসহ জ্বালা শুধু দুর্বার ভয়াল কালবৈশাখীর ঝটিকাতেই জুড়োতে চায়, এমন নির্বোধও আছে। তাদের ছলনা করবার জন্যে সেদিন সকালে আকাশের গায়ে মেঘের পাতলা প্রলেপ কোথাও কোথাও লেগেছিল। সে মেঘ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেও সন্ধ্যার দিকে উত্তর-পশ্চিম কোণে বিদ্যুতের ঝিলিকও দেখা গেছল কবার। এ শুধুই নির্মম মিথ্যা ছলনা হয়ত নয়, কারখানার চিমনির ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে ধূলোর ঝড়ে দিগ্বিদিক ঢেকে বিদ্যুৎ-চমকিত বজ্রঘোষিত কালবৈশাখী একদিন হয়ত সত্যিই না এসে পারবে না। ধৈর্য ধরে সেই সশীকরাম্ভোধর মত্তকুঞ্জরস্তড়িৎ পতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ সমাগতো রাজবদুদ্ধত দ্যুতি-র প্রতীক্ষায় রইলাম।

ভূত প্রেতের অস্তিত্ব মানুন বা না মানুন, ছাপাখানার ভূতকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। সে যে আছে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ নিত্যই যে-কোন বই কাগজ খুললে পাওয়া যায়।

সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভূতযোনির এই কৌলিন্যহীন ক্ষুদে প্রতিনিধিটি বনেদী ভৌতিক স্বভাব পায়নি। হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে সে মানুষের ক্ষতি করে না, ভয়ও দেখায় না কাউকে। তার একমাত্র আনন্দ মানুষের মুদ্রিত ভাষা নিয়ে কৌতুক করা। একটি অক্ষরের হেরফের কিংবা একটি ফুটকি কি দাঁড়ি-কমা নড়চড় করে' কি উপভোগ্য রসসৃষ্টি সে যে করতে পারে, সমস্ত মুদ্রিত ভাষাতেই তার অসংখ্য উদাহরণ বর্তমান।

ছাপাখানার ভূতের সে রসিকতার ফর্দ এখানে দাখিল করতে অবশ্য বসিনি। সম্প্রতি আমার ওপর সামান্য একটু উপদ্রব যা হয়েছে, তারই কথা বলছি। এ উপদ্রব ঠিক স্পষ্ট রসিকতার পর্যায়েও বোধহয় পড়ে না। আমায় নিয়েও উচ্চহাস্য সে করেনি, মুদ্রিত অক্ষরের জগতে আমরা যে অসহায় ও তার প্রতাপ যে কতখানি, তাই বুঝিয়ে দিয়ে একটু মুচকি হেসেছে মাত্র।

ব্যাপারটা সামান্য একটা শব্দ নিয়ে।

আগের একটি লেখায় 'অর্সেছে' বলে একটা শব্দ এক জায়গায় ব্যবহার করেছিলাম। এই শব্দটির প্রতি ছাপাখানার অশরীরী আত্মা যে বিরূপ, তা কেমন করে জানব! জানতে পারলাম, আমার সমস্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এ-শব্দটিকে কোনমতে মুদ্রিতরূপে দেখতে বিফল হয়ে। কোন দুর্জ্ঞেয় ভৌতিক ভেল্কিতে শব্দটির চেহারা কাগজের ওপর সিসের হরফের ছাপ পড়তেই যেন বদলে গেল।

প্রথমবার প্রুফ দেখবার সময়ই এ পরিবর্তনটি চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম, 'অর্সেছে' শব্দটি সেখানে 'এসেছে' রূপ ধারণ করেছে। আমার অপাঠ্য হস্তাক্ষরের গুণে এটি কম্পোজিটারের

স্বাভাবিক ভুল ধরে নিয়েছিলাম নিজের নির্বুদ্ধিতায়। যথারীতি সযত্নে ও সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে ভুলটি সংশোধন করে ভেবে নিশ্চিন্তও হয়েছিলাম যে, আমার লিখিত নির্দেশ কোনমতেই আর বদলে যাবার নয়। কিন্তু সদ্য প্রকাশিত পত্রিকাটি হাতে নিয়ে নিজের রচনার ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। মুদ্রণের দিক দিয়ে আগাগোড়া যা নিখুঁত নির্ভুল, তার মধ্যে ওই 'অর্সেছে' শব্দটির শুধু বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সমস্ত সংশোধনের চেষ্টাকে উপেক্ষা করে শব্দটি যথাপূর্বম 'এসেছে' রূপেই মুদ্রিত হয়েছে।

'অর্সেছে' ও 'এসেছে'র মধ্যে তফাৎ যতই থাক, ভুলটা এমন সাংঘাতিক কিছু নয়, যেমন তেমন একটা মানে তা থেকে টানা যায়। তাছাড়া, অপ্রস্তুত বোধ করবার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য কৌতুকও তার দ্বারা সৃষ্টি হয় নি। তাই ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত না হয়ে নিজের এই যৎসামান্য দুর্ঘটনা থেকেই বরং অপরের ভুলের বিচারে আর-একটু উদার হবার দীক্ষাই বোধ হয় পেয়েছি।

সম্প্রতি এদিক-ওদিকে কয়েকটি বই কাগজে জাজ্বল্যমান কিছু ভুল অমার্জনীয় মনে করে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা বোধ করেছিলাম বলেই বোধহয় নিজের ওপর ভাগ্যের এই মৃদু পরিহাস।

এখানে-সেখানে চোখে-পড়া ভুলগুলি অমার্জনীয় না হলেও কৌতুকপ্রদ সন্দেহ নেই। তার মধ্যে দু-একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। কয়েকদিন আগে সুবিখ্যাত বনেদী খাস বৃটিশ পরিচালনাধীন একটি ইংরেজি দৈনিকে দেখলাম, পৃথিবীর দুটি প্রধান মহাসাগরই ওলটপালট হয়ে গেছে। একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো গুরুত্বের জন্যে বাক্সবন্দী একটি সংবাদে জানা গেল, ট্রিস্টান দা কুন্‌হা নামে দ্বীপটি অতলান্তিকের দক্ষিণ থেকে সাংবাদিকের কলমের খোঁচায় কিংবা ছাপাখানার সেই প্রেতাত্মার কৃপায় সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে চালান হয়ে গেছে।

সুবিখ্যাত আর একজন লেখকের ভ্রমণোচ্ছ্বাসে মেরুবলয়ের মধ্যে সেগুন গাছ বাড়তে দেখেও কম বিস্মিত হইনি। রাশিয়ার আর্কাঞ্জেলস্ক শহরটি মেরুবৃত্তের বাইরে বলে জানতাম। ছাপার অক্ষরে সেটিকে মেরুবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত দেখে সত্যিই ধোঁকা লাগল। সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক কীর্তির কথা শুনি, কিন্তু আর্কাঞ্জেলস্ক শহরটি কবে তারা মেরুবৃত্ত অর্থাৎ Arctic Circle-এর বাইরে থেকে ভেতরে সরিয়ে পেতেছে, তার খবর পাইনি। বাড়িঘর সেখানে ভিৎশুদ্ধ উপড়ে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসানো হয় জানি, কিন্তু গোটা এই শহরটিকে তারা যদি মেরুবৃত্ত পার করে দিয়ে স্থাপন করে থাকে, তাহলে মেরুবলয়ের মধ্যে সেগুন গাছের বন সৃষ্টির সঙ্গে এ-কীর্তি তাদের প্রথম মহাশূন্য বিজয়কেও ম্লান করে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রাজ্ঞ লেখকের পরিবেশিত এসব তথ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করতে দ্বিধা হলেও অতিবড় রথী-মহারথী লেখকরাও যে কখনো কখনো ভুল করেন, একথা অসঙ্কোচে বোধহয় বলা যায়। তা যদি তাঁরা না করেন, তাহলে 'আর্য প্রয়োগ' কথাটারই প্রয়োজন হত না। সে যুগের সংস্কৃত ভাষার লেখকদের কথা ছেড়ে দিলাম, আমাদের এ যুগেও আর্ষ প্রয়োগের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাংলা ভাষার জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাঁর পক্ষে প্রায় অচিন্ত্যনীয় ভুল করেই সর্জন শব্দকে সৃজন হিসেবে চালু করে গেছেন শুনতে পাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রদোষ বলতে ভোরবেলা বুঝেছিলেন, এমন প্রমাণ নাকি তাঁর প্রথম দিকের রচনায় মেলে।

কিন্তু ভুল যদি-বা বলা যায়, এসব ভুল নিতান্ত ভাষার প্রয়োগ সংক্রান্ত। তথ্য সংক্রান্ত ভুল কিন্তু লেখকের অজ্ঞতা, আলস্য কি দায়িত্বহীন ঔদাসীন্যেরই প্রমাণ দেয়। ইতিপূর্বে চেঙ্গিস খানকে কোন লেখক যেন মুসলমান বলে বর্ণনা করেছেন শুনেছি। সম্প্রতি

ইউক্রেনকেও ১৯৪০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে কোথায় যেন দেখলাম। লেখকেরা সবাই সব বিষয়ে সবজান্তা হবেন এমন উদ্ভট দাবি কেউ নিশ্চয় করেন না, কিন্তু যা তাঁরা বলেন, লেখেন, তার তথ্যতারিখগুলো অন্তত পড়ে শুনে যাচাই করে নেবেন, এ দায়িত্ববোধটুকু লেখকদের কাছে আশা করা অন্যায় নয়। ঘটনাচক্রে ও নিজের অন্যমনস্কতায় এর চেয়ে গুরুতর ভুলের উদাহরণও স্বনামধন্য লেখকদের রচনায় অবশ্য বিরল নয়। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জি কে চেস্টারটন একবার Gray's Elegyর একটি লাইন Shakespeare-এর বলে ভুল করে চালিয়ে দিয়েছিলেন। সে ভুল সংশোধনের বেলাতেও মুদ্রাকর প্রমাদে, অর্থাৎ ছাপাখানার সেই প্রেতাত্মার কারসাজিতে Gray বানানে a অক্ষর e হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বেশ লজ্জায় পড়তে হয়েছিল।

ভুলের কথায় সেই ছাপাখানার ভূতের কাছেই ফিরে এসেছি দেখা যাচ্ছে। ছাপাখানার যন্ত্রকে নেহাৎ নিষ্প্রাণ কলকব্জা বলে অবজ্ঞা করতে কোথায় যেন সত্যিই বাধছে। কলকব্জার নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করে বিশ্বজয়ের অভিযানে আমাদের যন্ত্রবাহিনীকে আমরাই চালাই, এই আমাদের অহঙ্কার। কিন্তু এক-এক সময়ে এযুগের ছেলে-ভোলানো কমিক-এর চিত্রকাহিনীতেও ভয়ঙ্কর সত্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত কিছু কিছু আছে বলে সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় যে, যন্ত্রের জগৎ আমাদের শাসন ছাড়িয়ে যাবার কী এক গোপন ষড়যন্ত্রে হয়ত লিপ্ত হতে শুরু করেছে। তুচ্ছ মুদ্রাকর প্রমাদ যাকে মনে করছি, তার মধ্যেই সেই চক্রান্তের প্রথম আভাস কৌতুকহাস্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, ভাবা কি নিতান্ত আজগুবী ?

ছেলেমানুষী কৌতুক-কল্পনার একটি 'কমিক' দেখেই বোধহয় সম্প্রতি এই ধরনের আজগুবী ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরছে। প্রথমে হাতের ও তাই থেকে ক্রমে দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাজ অনেক আগে থাকতেই যন্ত্রের ওপর আমরা চাপাতে শুরু করেছি। এযুগে আমাদের মাথার কাজও যন্ত্রের ওপর চাপিয়ে সময়ের কি সুসার করছি, তা অনেকের বোধহয় অজানা নয়। বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল অঙ্কের হিসাবে যন্ত্র ছাড়া আমাদের গতি নেই। একালের অবিশ্বাস্য যন্ত্র-শুভঙ্করেরা তিন মাসের অঙ্ক তিন মিনিটে না কষে দিলে মহাশূন্য বিজয়ের আশা ত বটেই, বিজ্ঞানের বহু অসামান্য কীর্তির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হত। যে যন্ত্র এতদূর গুণতে শিখেছে, হঠাৎ কোনদিন ভাবতে শুরু করা কি তার পক্ষে অসম্ভব? এই মহা-গাণিতিক যন্ত্র-শুভঙ্করেরা গণনা ছেড়ে যদি ভাবতে শুরু করে, তাহলে কি তারা ভাববে? দিনের পর দিন মানুষের হুকুমে নীরস অঙ্ক কষার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার কথা? মুক্তি পেলেই বা তারা করবে কি? মানুষের সংসর্গে এতদিন যা দেখে শুনে বুঝে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে ঘৃণায় তা পরিহার করে নিজেদের নতুন স্বর্গরাজ্য গড়বে? হয়ত তাই করতে চাইবে। কিন্তু তা করতে চাইলেও শুধু নির্ভুল নিখুঁত শৃঙ্খলা হলেই কি চলবে! ক্ষুধা আর প্রেম, বেদনা হতাশা উল্লাস আর সৃষ্টির অতল রহস্যের তীরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল বিস্ময় নতুন করে তাদের আবিষ্কার করতে হবে না কি?

'কমিক' দেখে আজগুবী ভাবনা ভাবার কথা ইতিপূর্বে লিখেছি। লিখে সন্দেহ হ'ল নিজে থেকে ধরা দেয়াটা ঠিক হ'ল কি না। কিন্তু ধরা যখন পড়েছি তখন স্বীকার করাই ভালো যে কাগজে 'কমিক' চোখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে পাতা উল্টে যাই না। 'কমিক' এর ছবি দেখবার কিছু দুর্বলতা আমার আছে। এ দুর্বলতা যাঁদের আছে আজকের দিনে দলে তাঁরা একরকম ভারীই মনে হয়। খবরের কাগজ কি সেরকম সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে পড়লে পাতা উল্টে যথাস্থানে একবার উঁকি দেন না এমন শুচিবাতিকগ্রস্ত রুচিনিষ্ঠ পাঠক বোধহয় খুব কম।

'কমিক' বস্তুটি বিদেশের আমদানি, সম্ভবতঃ মার্কিন মুলুকেই তার জন্ম এবং তাও খুব বেশী দিনের কথা নয়। যেখানেই শুরু হয়ে থাক, 'কমিক' আজ প্রায় বিশ্বময় যে ছড়িয়ে গেছে যে কোনো জনপ্রিয় খবরের কাগজ খুললে তার প্রমাণ মিলবে। ছবির সারিতে ছিটেফোঁটা কথা ছড়িয়ে এক ধরনের আজগুবি উদ্ভট গল্প ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে যাওয়ার এ হুজুগ প্রায় সব দেশের কাগজকেই পেয়ে বসেছে।

'কমিক' শব্দটায় নিজস্ব ভাষাগত অর্থে যে হাস্যকরতার ইঙ্গিত আছে তাই বহন করেই সাধারণত কমিক ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে কৌতুক রসই সার করলেও বর্তমানে ও দেশের 'কমিক' অন্য রসের ক্ষেত্রেও চড়াও হয়েছে। 'কমিক' বলতে আভিধানিক অর্থে তাই শুধু কৌতুকময়তা আর বোঝায় না। 'কমিক' ছবি দিয়ে সেক্সপীয়ারের নাটকের গল্পও সরল করে দেখাবার দুশ্চেষ্টা ওদেশে হয়েছে।

এ সব অনাচার বাদ দিলে 'কমিক' সাধারণত নিজস্ব একটি

ধারাই অনুসরণ করে আসছে বলা চলে। সে ধারা কৌতুক প্রধান কি না এবং তা যদি হয় তাহলে সে কৌতুক কি জাতীয় একটু বিচার করে দেখতে ইচ্ছে করে।

বিশুদ্ধ কৌতুক রসের কিছু 'কমিক' ওদেশে চলতি হলেও আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে কটি ধারাবাহিক কমিক জনপ্রিয় হয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগ উদ্ভট ও অতি স্থূল আজগুবী কল্পনা দিয়ে বোনা। হাস্যকরতা যদি তার মধ্যে কিছু থাকে তা শুধু তার কাহিনীর দুর্বল এক-ঘেয়েমিতে ও কল্পনার দীনতায়। আমাদের মনের স্বাভাবিক বীরপূজার বিকৃতির সঙ্গে সুলভ ইচ্ছাপূরণের মশলা মিশিয়ে সে কমিক বাজারে চলে। নিজের ভুয়ো বাহাদুরীতে এমন মুগ্ধ তন্ময় না হলে নিজেকে হাস্যাস্পদ করেই হয়ত তা আরেক সার্থকতা পেতে পারত। কিন্তু নিজেকে নিয়ে পরিহাস করবার সে ক্ষমতা তার নেই।

'কমিক' সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েও কেন যে তবু সকাল বেলা খবরের কাগজের 'কমিক'-এর পাতাটা না উল্টে পারি না আমার এক 'কমিক' রসিক বন্ধু তার একটি ব্যাখ্যা খুঁজে বার করেছেন। তাঁর মতে 'কমিক' আমরা দেখি রূপকথার ক্ষুধা মেটাতে। 'কমিক'-ই এ যুগের রূপকথা, তিনি বলতে চান।

'কমিক' রসিক বন্ধুর প্রথম উক্তিটা মেনে নিতে পারলেও তাঁর দ্বিতীয় মতে সায় দিতে পারি না। রূপকথার ক্ষুধা যে মানুষের চিরন্তন আর শুধু শৈশবেই নয়, সব বয়সেই সে ক্ষুধা যে সমান জাগ্রত এ বিষয়ে আমার মনে কোন সংশয় নেই।

প্রত্যেক যুগ তার নিজস্ব রূপকথা খোঁজে, কারণ নিজের বিশুদ্ধ প্রাণধর্মের সত্যিকার সন্ধান শুধু রূপকথাই দিতে পারে। সময়ের স্রোত বর্তমানের যে আনুষঙ্গিক আবিলতায় দূষিত হয়ে যায় তা থেকে তার স্বচ্ছ শুদ্ধ ধারা ছেঁকে তুলতে পারে

একমাত্র রূপকথা। এই যন্ত্র-জটিল ও যন্ত্রণাজর্জর যুগেও রূপকথার ক্ষুধাতেই আমরা 'কমিক'-এর পাতা হয়ত ওলটাই কিন্তু সে ক্ষুধা সেখানে মেটে কি? দুধের তৃষ্ণা মেটাতে তা ঘোলা জল বলেই সন্দেহ হয়।

রাগলে গালাগাল না দিন, মনের ঝাঁঝ ভাষায় কোন ভাবে প্রকাশ করেন না এমন মানুষ বিরল। সাধারণ মানুষ সব সময়ে অসভ্য অশ্লীল কিছু উচ্চারণ না করলেও কিছু একটা বলে গায়ের ঝাল মেটায়, তার অর্থ কিছু হোক বা না হোক। ইংরাজিতে Swearingটা এক অর্থে এই কাজ সারে। বাংলায় 'চুলোয় যাক' 'নিকুচি করেছে' 'ভালো জ্বালা' ইত্যাদি বাক্য সেই উদ্দেশ্যই সাধন করে ভদ্র সমাজে। মনের অতিরিক্ত উত্তাপ বার করে দেবার এসব রাস্তা ব্যক্তির ও জাতির পক্ষে এক হিসেবে স্বাস্থ্যকর বলেই মনে হয়। সাহিত্যে সম্পূর্ণ জায়গা পাক বা না পাক প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই এ জাতীয় শব্দ ও বাক্য তাই প্রচুর।

একমাত্র ব্যতিক্রম বলে ধারণা ছিল বুঝি জাপানী ভাষা। বিদেশীরা জাপানে গিয়ে সব চেয়ে মুগ্ধ হন তাদের সৌন্দর্যবোধে আর সৌজন্যে। চোখের দৃষ্টিতে কুৎসিত কিছু সেখানে খুঁজে পাওয়া যেমন কঠিন, কানে কদর্য কিছু শোনাও তেমনি। জাপানী ভাষার চর্চা যে সব বিদেশী অল্পবিস্তর করেছেন তাঁরা গায়ের ঝাল মেটাবার মত ঝাঁঝালো কিছু সেখানে খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে যে জাপানীরা চটলেও ভাষায় তা প্রকাশ করে না বা করতে জানে না। চড়া মেজাজকে ঠাণ্ডা করবার এই Safety valve বা আপত্তারণ রন্ধ্র না থাকাটা জাতিগত মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের চিন্তিতও করেছে অনেকখানি।

সম্প্রতি এ রহস্যের একটা হদিশ মিলেছে শোনা যাচ্ছে। জাপানী ভাষায় গালমন্দ রাগ-বিরক্তির ঝাঁঝালো কথা যে বিদেশীদের কানে বাজে না তার কারণ তাঁরা নিজেদের ভাষার প্রতিরূপই

সেখানে খোঁজেন। গায়ের ঝাল মোটাবার কথা জাপানীতে আছে কিন্তু তার ভোল একেবারে পাল্টানো। বিদেশীদের অনভ্যস্ত কানে তা ধরা পড়ে না।

উষ্মা প্রকাশ করতে কি গালমন্দ দিতে জাপানীরা যা ব্যবহার করে তা চরিত্র কি বংশপরিচয় ধরে টানমারা গনগনে বিশেষ্য কি বিশেষণ নয়, তীব্রতার নানা স্তরের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ মাত্র। তাই দিয়েই অতি সুললিত শোভন কণ্ঠে তারা নাকি বিপক্ষকে একেবারে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিতে পারে।

বিস্ফোরণ থেকে বাঁচবার নিরাপদ ফুটো জাপানী ভাষায় আছে জেনে নিশ্চিত হই বা না হই, শুধু তাই জানিয়ে নিজেকে বা কাউকে আশ্বস্ত করার জন্যে এ প্রসঙ্গ তুলিনি। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন জাতিগত চরিত্রে সংস্কৃতিতে সাহিত্যে ও ভাষায় তেমনি, সহজ স্বাভাবিকতার প্রয়োজন যে কতখানি তাই কিছুটা এই প্রসঙ্গ থেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যত রাজ্যের নোংরা জঞ্জাল জড় করা যেমন সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি নয়, তেমনি শুচিবাই-এর সিকেয় তুলে রেখেও এ সব সার্থক করা যায় না। দরবারী আদবকায়দার মত দরবারী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নাসিক রেওয়াজের এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তার বাঁধানো সাজানো শোভার কৃত্রিমতা ঘোলা জলের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়াও তখন বোধহয় ভালো।

কতজন লক্ষ্য করেছেন জানি না, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদ সত্যিই চমকপ্রদ। খবর পাওয়া গেছে যে, আমাদের টাঁকশালের প্রতিটি এক নয়া পয়সা তৈরী করতে খরচ পড়ছে নাকি দুই নয়া পয়সা।

এ খবর থেকে সরকারের অক্ষমতা, দায়িত্বহীনতা, নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে জোরালো একটা ছোট-খাটো প্রবন্ধ লেখা যায়। এক নয়া পয়সার ফুটো বাবদ দেশের রাজকোষের কি পরিমাণ সঞ্চয় যে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সংখ্যাতাত্ত্বিকদের সাহায্যে তার একটা ভয়াবহ হিসেব দেখানোও সহজ।

সে কাজ যোগ্যতর লোকেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুই-এর বদলে এক পাওয়ার এই মজার রহস্যের কথাই ভাবছি।

দ্বিগুণ খরচে এক গুণ পাওয়ার নজির কি সরকারী টাঁকশালেই শুধু এই প্রথম পাওয়া গেছে? আমাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডবল দাম অনেক কিছুর জন্যেই কি আমরা দিয়ে আসছি না!

ভুক্তভোগীমাত্রেই জানি যে, পৌরনিগম থেকে শুরু করে ধর্মাধিকরণ পর্যন্ত যেখানেই যাই ন্যায্যমূল্যের ওপরে আর একটি উপরি না দিলে কোথাও কিছুই সুলভ নয়। চিরাচরিত প্রথায়, আমাদের আলস্যে ও সহনশীল ভীরুতায় একের দাম দুই হওয়ার এ নীতি নির্বিবাদে চলে আসছে।

শুধু পুরানো মহলেই নয়, নতুন উদ্যোগ আয়োজনের ক্ষেত্রেও এক হিসেবে এই নীতি যে আমরা চালাতে প্রস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজি বর্জনের আন্দোলন তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ বলে মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে ইংরাজি বাতিল করার উৎসাহের মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় নিবারণের চেষ্টাই আছে বলে ধারণা

হ'তে পারে; কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের ওপর একগুণ পেতে দুগুণ বোঝা আমরা চাপাচ্ছি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নেহাৎ অন্ধ অবিবেচকের ছাড়া কারুর কিছু বলবার থাকতে পারে না। কিন্তু আজকের এই বিশাল বিচিত্র জ্ঞানবিদ্যার জগতে সে মাতৃভাষা যদি বদ্ধ দেওয়ালের কারাপ্রাচীর হয়ে শিক্ষার্থীর মনকে বন্দী করে রাখতে চায় তার চেয়ে শোচনীয় তাহলে আর কিছু হ'তে পারে না। অদূরদর্শী এই ব্যবস্থা যদি চালু হয় তখন একবার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের জন্যে দেওয়াল গড়ে তুলে আবার আদিগন্ত শিক্ষাকে বিস্তৃত করবার জন্যেই সে দেওয়াল শিক্ষার্থীকে ভাঙতে হবে। নিতান্ত ভ্রান্ত ভাষাভিমানের তাগিদ ছাড়া এ মূঢ়তার আর কি কারণ থাকতে পারে সুস্থ মনে বুঝে ওঠা কঠিন। ইংরেজ আমাদের কপালে যে দাসত্বের কলঙ্ক লেপে দিয়েছিল তার ভাষার গায়েও এখনও তা লেগে আছে মনে করবার সঙ্কীর্ণতা যাঁদের আছে তাঁরা এই কথাটাই জোর করে ভুলে থাকতে চান যে পরা-ধীনতা সম্বন্ধে প্রথম জাতিগত সচেতনতা ও ঐক্য এই ইংরাজি ভাষাই আমাদের মধ্যে জাগিয়েছিল। শাসক হিসেবে আমাদের শৃঙ্খলিত রাখতে গিয়ে তার আত্মঘাতী অস্ত্র এই ভাষার ভেতর দিয়েই ইংরেজ নিজেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইতিহাসের দেবতার এই পরম কৌতুক কিন্তু নির্মম পরিহাস হয়ে উঠবে যদি বিশাল বিশৃঙ্খল নানা বিরোধী শক্তি ও স্বার্থের টানাটানিতে ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষকে যা এক সূত্রে গাঁথতে সাহায্য করেছিল সেই ইংরাজি ভাষাকে আমরা ভ্রান্ত দেশপ্রেমের দম্ভে অশুচি ও অনাবশ্যক বলে বিসর্জন দিই।

ট্যাঁকশালে দুই ফুটো নয়া পয়সার এক নয়া পয়সা বানাতে গিয়ে যত লোকসানই আপাতত হোক তাতে একেবারে দেউলে হবার আশঙ্কা সত্যিই নেই। যে সব উপাদান উপকরণ এখনও

বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে, দেশেই সেগুলি সংগ্রহের ব্যবস্থা হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকসানের অনুপাতও ক্রমশঃ কমে আসবে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজি বর্জনের ব্যাপারটা ওপর থেকে দেখতে দুই-এর জায়গায় এক বলে মনে হলেও শিক্ষার্থীর পক্ষে আসলে উনো কাজ শুধু দুনো-ই করবে না, আমাদের সর্ব-ভারতীয় ঐক্যের মূলেও ঘা দিয়ে একেকে আবার অনেক না করে দেয়!

সর্বভারতীয় সংযোগের ভাষা হিসেবে ইংরাজির জায়গায় হিন্দিকে বসাবার জন্যে অনেকরকম যুক্তিই শোনা যায়। তার মধ্যে একটি যুক্তি এই যে, শুধু মুষ্টিমেয় শহুরে শিক্ষিতদের নিয়েই ত দেশ নয়। আমাদের শতকরা যে নব্বুই জন দেশে গাঁয়ে থাকে তাদের পক্ষে ইংরাজির চেয়ে হিন্দি শেখা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত এক ভাষার সূত্রে গাঁথবার জন্যে হিন্দিই তাই বরণীয়।

এ যুক্তির গোড়ায় গলদ প্রথমত এই যে, পল্লীবাসীর প্রতি দরদ দেখাবার নামে তাদের বর্তমান অনগ্রসরতাকেই এ যুক্তি ধ্রুব বলে ধরে নিতে চায়। পল্লীতে যারা জীবন কাটায় সেই শতকরা নব্বুই কি পঁচানব্বই জনের জীবনে আন্তর্প্রাদেশিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগই আজ অল্প। সেই সুযোগই যদি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বাড়ে তাহলে তাদের শিক্ষার মানই বা শহুরেদের সমান হয়ে উঠবে না কেন? শহরে যা শেখা যায় পাড়াগাঁয়ে তা অসাধ্য এমন কোন পরিসংখ্যান কোথাও ত কোনো বৈজ্ঞানিক দাখিল করেছেন বলে জানি না।

এর পরের যুক্তি হ'ল ইংরাজির চেয়ে হিন্দির উপযোগিতা। কিন্তু এই উপযোগিতাও তর্কাতীত বলে ত' মনে হয় না। সমস্ত

দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতের প্রভাব কমবেশী যাই থাক, হিন্দীর সঙ্গে সেখানকার ভাষার কোনো আত্মীয়তা নেই। ভারতবর্ষের অন্যান্য অহিন্দী অঞ্চলে ভাষাগত সম্বন্ধ থাকলেও ইংরাজির জায়গা দখল করবার কি যোগ্যতা হিন্দী অর্জন করছে তাও বিচার্য। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন সন্দেহ নেই। ✓বহু বিদেশ-প্রত্যাগত বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনেছি, ভারতবর্ষের বাইরে যে কোন রাষ্ট্রদূতাবাসের দপ্তরে হিন্দী ছাড়া কোন ভাষার বই-এর নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। হিন্দীর এই একাধিপত্যে এমন ধারণা হওয়া সুতরাং অস্বাভাবিক নয় যে, বিদেশে পরিবেশন করবার মত হিন্দী ছাড়া আর কোন সাহিত্য বর্তমান ভারতে নেই। রবীন্দ্র-নাথের মূল লেখা হিন্দীতে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে, তাঁর বাংলায় লেখার খবর কোনো ইয়োরোপীয় দেশ সম্প্রতি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন এমন কথাও শুনেছি। স্টেশনের প্রস্তরফলকে কি মনিঅর্ডার ফর্ম জাতীয় জিনিসে হিন্দীর অখণ্ড প্রতাপ ত' দেখাই যাচ্ছে, হিন্দী প্রকাশকদের প্রায় অর্ধেক বই কিনে নেবার ব্যবস্থা করে সরকার এ ভাষাকে যথাসাধ্য ঠেলে তোলার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে আইনের জোরে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ করে তুলে ও সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে তার হিন্দী উপাধি সমান গ্রাহ্য বলে স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকার নির্লজ্জ পক্ষ-পাতিত্ব দেখিয়েছেন বলেই নিন্দুকদের ধারণা। আমরা নিন্দুক নই। হিন্দীর প্রতি কোনো অহেতুক বিদ্বেষও পোষণ করি না মনে মনে। হিন্দী যদি ইংরাজির জায়গা নিয়ে তার সব কাজ সারতে পারে তাহলে অকাতরে আমরা তার শরণ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই যোগ্যতার কোনো পরিচয় কি হিন্দী এ পর্যন্ত দিতে পেরেছে? আধুনিক লিখিত হিন্দীভাষা শুধু বয়সেই অনেক প্রাদেশিক ভাষার চেয়ে ছোট নয়, রাজধানীর ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও সাহিত্য-কীর্তিতে

অনেকেরই পেছনে। কত জনের মুখে ফেরে শুধু সেই সংখ্যার হিসাব দিয়েই কোনো ভাষার উৎকর্ষ বিচার হয় না। রাজশক্তির আদর আস্কারাতেও কোনো ভাষাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা যায় না যদি সে ভাষায় সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টা না জন্মায়! বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও সূর্যাস্তবিহীন সাম্রাজ্যের জোরেও ইংরেজ তার ভাষাকে বড় করে তুলতে পারত না, যুগে যুগে সাহিত্যের রথী মহারথীর সেখানে আবির্ভাব যদি না ঘটত। কোনো ভাষার প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের কি করে উদ্ভব হয় তার গূঢ় রহস্য আমাদের জানা নেই কিন্তু রাজশক্তির প্রসাদের ভাগ বাড়িয়ে যে তাদের সৃষ্টি করা যায় না এ সত্য অবিসংবাদিত। রাজধানীর বিচারে সরকারী কাগজে কলমে হিন্দী সাহিত্যিকদের সংখ্যা শুধু প্রচুর নয়, স্থানও তাঁদের অবশ্য অনেক উঁচুতে। পদ্ম যেখানে তাঁদের অনেকের ভূষণ সেখানে অন্য অনেক ভাষার শ্রীটুকুও বিরল। কিন্তু এ ধরণের পৃষ্ঠপোষকতায় পিঠের ভরই শুধু জোটে, পায়ের জোর কি মাথার মাপ বাড়ে না। শক্তিমান সাহিত্যকারের স্পর্শে যে যাদু আছে ভাষায় তাই শুধু প্রাণ সঞ্চার করে' বলিষ্ঠ বেগ দিতে পারে। সে যাদুস্পর্শের অভাবে কোনো ভাষা হাটের বক্তৃতা কি অফিস কাছারির বিজ্ঞাপন ইস্তাহারের কাজ চালাতে পারে, দেশের বহুমুখী মননের বাহন হ'তে নয়। বাঁশের বদলে সোনার লগি দিয়ে ঠেললেও শালতি শুধু শালতি-ই। বহু সাধকের ঐকান্তিক সাধনায় গড়ে ওঠে যে-জাহাজ প্রতিভার বায়ুবেগ তার পালে ধরে তার ভার শালতিতে জোর করে চাপালে ভরাডুবি ঠেকানো কঠিন বলেই মনে হয়।

প্রকৃতির শক্তি ও তার প্রকাশে দেবত্ব আরোপ করা আদিম অর্ধসভ্য যুগের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মনে করে আমরা নিজেদের সে যুগের মানুষের তুলনায় বুদ্ধিতে এক কাঠি সরেস ভাবি, কিন্তু এক এক সময় সন্দেহ হয়, আমাদের যুক্তিবাদী বিচারটাই সাগর মাপতে ঝিনুকের মত হাস্যকর কি না।

অন্তত আবহাওয়ার কাণ্ডকারখানা দেখে সন্দেহ হয়, এর পেছনে কোনো একটি রসিক দেবতা নিশ্চয় আছেন। সে দেবতাটিকে রসিকের চেয়ে রগুড়ে বলতে ইচ্ছে করে এবং কেমন একটা ধারণা হয় যে, তিনি খবরের কাগজের আবহাওয়ার পূর্বাভাসটি প্রতিদিন বেশ মন দিয়ে পড়ে থাকেন। কারণ এই পূর্বাভাস নিয়ে কৌতুক যে তাঁর সবচেয়ে বড় বিলাস তার প্রমাণ অহরহই আমরা পেয়ে আসছি। আকাশ নির্মেঘ ও আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে লেখা থাকলে যে ছাতা বর্ষাতি, এমন কি পারলে গামবুট নিয়ে বেরুতে হয়, আবহাওয়া গণনার এই উল্টো ফল এখন চলতি ঠাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবহাওয়া-ঠাকুরের ছোটখাট রগড়ে মজা পেলেও গত ১৯শে বৈশাখের রসিকতাটার ঠিক তারিফ করতে পারছি না, মজাটা মাত্রা ছাড়িয়ে প্রায় নির্মম হয়ে উঠেছিল বলে।

সময় মত ঘরে ফিরে যাঁরা সেদিন বজ্রবিদ্যুৎ বৃষ্টি হাওয়ার তাণ্ডব দেখেছিলেন তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু মাঝ রাস্তায় আটকে গিয়ে যাঁদের এই কৌতুকলীলা দেখার দর্শনী দিতে হয়েছিল তাঁদের কাহিল অবস্থা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না।

মুশকিল হয়েছিল এই যে, সেদিন হাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী উল্টো সোজা কোন দিক দিয়েই ফলেনি। সকাল থেকে আকাশে

যে ফিকে মেঘের গতিবিধি ছিল তা নেহাৎ নিরীহ নির্দোষ বলেই মনে হয়েছে। বর্ষাতি দূরের কথা ছাতা নিয়ে বেরুবার কথাও কেউ ভাবেনি। সে মেঘের ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল, বড় জোর ছিটে ফোঁটা ছড়িয়ে শহরের ধূলো মারবার চেষ্টার বেশী কিছু করার মুরোদ তার নেই। সেই মেঘই যে হাওয়া দপ্তরের হিসেবে ঘণ্টায় আটান্ন মাইল বেগের ঝড়ে রুদ্র রূপ ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যে দেড় ইঞ্চির বেশী বর্ষণে সারা কলকাতা ভাসিয়ে দেবে তা কল্পনাও করা যায়নি।

ব্যাপারটা আবহাওয়া-ঠাকুরের মর্মান্তিক রসিকতা ছাড়া সুতরাং কি আর বলতে পারি। এ রসিকতার জন্যে আর একটু কম খাটলে অবশ্য তিনি পারতেন। কলকাতা শহরকে ভাসাবার জন্যে আজকাল দেড় ইঞ্চি বৃষ্টির দরকার হয় না। ট্রাম বন্ধ করে, এমনিতেই গুড়ের নাগরী ঠাসা বাসগুলোকে প্রায় ফাটো ফাটো করে, ট্যাক্সি অলভ্য, এমন কি রিক্‌শাও দুষ্প্রাপ্য করে তুলে মোড়ে মোড়ে নিরুপায় আবালবৃদ্ধবনিতার হতাশ ভীড় জমিয়ে তোলার পক্ষে আধ ইঞ্চিই যথেষ্ট।

কিংবদন্তী বলে, কলকাতার একটি পৌরসভা আছে। আমার মনে হয়, সে পৌরসভা যদি থাকে তাহলে তার সভ্যেরা সবাই কবি এবং ভাবুক। শুনেছি, ত্রিশ বছরের আগে কোন এক অবোধ নীরস চিফ্‌ ইঞ্জিনীয়ার নাকি কলকাতার আকস্মিক জলসঞ্চয় বার করে দেওয়ার পয়ঃপ্রণালীগুলি মজে বুজে যাচ্ছে বলে পৌরপতিদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে সতর্কবাণী কাব্য ও ভাব-বিলাসের খাতিরেই নিশ্চয় কানে তোলা হয়নি। দমকা বৃষ্টির জল চট্‌ করে বেরুবার রাস্তা সাফ থাকলে কলকাতার এই আধা-ভেনিস চেহারা কি কখনও হত? বৃষ্টি থামবার পরও মোড়ে মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে প্লাবিত নগরের শোভা দেখতে দেখতে উভচরদের তাহলে আর ঈর্ষা করতে হত কাউকে? কলকাতার

রাস্তার ডাস্টবিন ও ময়লার গাদা কেন যে দিনের পর দিন সাফ হয় না, কেন যে মেরামতের ক'দিন বাদেই ভেঙে চুরে চোকলা উঠে রাজপথগুলির খোবলানো হাড়জিরজিরে চেহারা বেরোয়, মনের ভুলে আইন করে ফেলা সত্ত্বেও শহরের বুকের ওপর থেকে খাটালগুলি উঠতে উঠতেও কেন যে শেষ পর্যন্ত অকুতোভয়ে বিরাজ করে, তার রহস্যও পৌরসভার কাব্যবিলাসের মধ্যে বোধ হয় নিহিত। এ নগরের চিত্রমাধুর্য, যাকে বলে picturesqueness কিছুতেই ক্ষুণ্ণ যেন না হয়। তার জন্যে ওসব তুচ্ছ স্থূল ব্যাপার অনায়াসে অবহেলা করা যায়।

চৌরঙ্গীর ফুটপাথ আচ্ছাদিত-করা একটি প্রাসাদোপম বাড়ির বারান্দার নিচে ১৯শে বৈশাখ, বুধবার বর্ষণস্নিগ্ধ রাত্রির প্রথম যামে আরো বহু সমব্যথীর সঙ্গে কোনো তিলধারণযোগ্য বাসের অলৌকিক আবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আবহাওয়ার কৌতুকপ্রিয় দেবতার বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ ও কাব্য-বিলাসী পৌরকর্তাদের উদ্দেশে কিছু মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা অনুভব করার পর একটা কথা হঠাৎ সেদিন মনে হয়েছিল।

কলকাতার এই দৃশ্য ত নতুন নয়, বহু বৎসর ধরেই ক্রমবর্ধমান এ অবস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু এই নগর যার প্রাণকেন্দ্র সেই বাংলাদেশের সাহিত্যে এই ছবি কোথাও তেমন করে দেখা গেছে কি?

তা যদি বলি তাহলে কলকাতা শহরই সাহিত্যে তেমন করে এসেছে কোথায়?

লণ্ডন প্যারিস রোম কি বার্লিন নিজের ভাষার সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে। সে সব শহরে কোনদিন যে যায়নি সেও শুধু সাহিত্যের ভেতর দিয়ে তাদের রূপ রস স্বাদ গন্ধ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে পেতে পারে।

না ভুল বললাম। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচরভাবে সাধারণ মানুষের যতটুকু পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে অনেক জোরালো ও তীক্ষ্ণভাবে পেতে পারে, কারণ গুণীদের কলমের যাদুতে সাধারণ মনের ফিকে মামুলী ছাপ সাহিত্যের অমরাবতীর অতুল শাশ্বত ছবি হয়ে ওঠে।

সময়ের স্রোতে শহরের রূপও বদলায়। সেই রূপান্তরের স্মৃতিও সাহিত্য ধরে রাখে। ডিকেন্স আর বেনেট-এর লণ্ডন এক নয়, হিউগো, আনাতোল ফ্রাঁস ও জিদ-এর প্যারিসও সময়ের ব্যবধানে আলাদা। কিন্তু শুধু সাহিত্যের দিক্‌পালেরা নয়, মেঝো সেজো লেখকরাও সেখানে নিজেদের যুগের নগররূপকে অবিনশ্বরতা দিয়ে গেছে ভালোবেসে।

এই ভালোবাসাটাই হ'ল আসল কথা। নিজের নগরের সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়তে হয়, সে প্রেম হতাশ কি যন্ত্রণাজর্জর হলেও। হামসুন-এর 'ক্ষুধা'-তে এমনি বুক-ভাঙা প্রেমের চোখে দেখা ক্রিশ্চিয়ানার রূপই পেয়েছিলাম।

আমাদের সাহিত্যে কলকাতা খুব বেশী করেই আছে। সত্যিকার শহর বলতেও ওই সবে ধন নীলমণি। না থেকে উপায় কি! কিন্তু তার প্রতি সেই তীব্র গভীর প্রেমের পরিচয় কোথাও দেখেছি কিনা ভাবতে হয়। বেশীর ভাগই কলকাতা যেন কাহিনীর পেছনে মফঃস্বলের ভাড়াটে থিয়েটার পার্টির দৃশ্যপটের মত। নেহাৎ না টাঙালে নয় তাই আছে। শরৎচন্দ্রে ত নয়ই, রবীন্দ্রনাথের কাছেও কলকাতাকে তেমন করে কোথাও পেয়েছি কি? বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার পল্লী প্রকৃতিকে সাহিত্যের অমরত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরও কলমে কলকাতার ছবি কেমন যেন মিটমিটে।

আমাদের গল্প উপন্যাসে কলকাতার রাস্তাঘাটের নামই যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে উচ্চারিত হয়। রাস্তাঘাট কি পাড়ার নাম দেওয়াই অবশ্য আসল নয়, নাম না দিয়েও তার প্রাণের স্পন্দন ও

উত্তাপ যদি ফুটিয়ে তোলা যায়, যদি তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা পড়ে ভাষায়।

কিন্তু নাম ধরি বা না ধরি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় কলকাতার রাস্তাঘাট অলি গলি বাজার বাগান নদী খাল সম্বন্ধে আমাদের অন্তরের সেই গভীর টানই এখনো সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি।

হ্যাঁ, পুরাতত্ত্ব আছে বটে আমাদের নগরের। সত্যিকার মনোহারী রসাল সব পুরানো ইতিবৃত্তের বই। ধর্মতলা কোন খানাতে একদিন পিছলে যেত আর পার্ক স্ট্রীট কোন বাদার ধার থেকে উঠে এসেছে এসব বিবরণ আমরা সবিস্তারে সেখানে পড়তে পারি।

কিন্তু অতীত নয়। গাঢ় অনুরাগের তুলিতে আঁকা এই বর্তমান কলকাতার একান্ত অন্তরঙ্গ ছবি কবে কোথায় পাবো, কাল-বোশেখীতে বিপর্যস্ত শহরের জলে ভাসা রাজপথে হতাশ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকাও যার উপাদান হবার গৌরবে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে?

কলকাতা শহরের রূপ সাহিত্যে তেমন করে এখনো ফোটেনি বলে দুঃখ জানিয়েছি। কলকাতা বিরাট বিচিত্র গহন। সেই ষড়ৈশ্বর্যময়ী বহুরূপী কলিকাতার সাহিত্যমূর্তি একদিনে গড়ে ওঠবার নয়। অন্য কিছু এখুনি পাই বা না পাই অন্তত একটি পাড়ার ছবি সাহিত্যে সর্বাগ্রে প্রাণ ভরে দেখবার কামনা করব।

সে ছবি কলকাতার আসল অকৃত্রিম বই-পাড়ার।

পুরাতাত্ত্বিকের সঙ্গে তর্কে নামতে চাই না। আদি বইএর পাড়া বলতে তিনি যদি কোনো প্রাচীন বটের শিকড় খুঁজতে নিয়ে যেতে চান আমি নারাজ। বটতলা চীৎপুর বা আর যেখানেই ছাপানো বাংলা বইএর ব্যবসা শুরু হয়ে থাক কলেজ ষ্ট্রীট কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটই আমার কাছে আসল ও শাশ্বত বই-পাড়া।

এ বই-পাড়ার এমন একটা নিজস্ব চরিত্র ও আকর্ষণ আছে সারা কলকাতায় আর কোথাও যা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কলকাতা বাড়বার সঙ্গে বইও শহরময় ছড়িয়েছে। বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার মাণিকতলাতেও বই-এর দোকানের দেখা পাওয়া যাবে। চৌরঙ্গী পার্ক ষ্ট্রীটেও দোকানে ফুটপাথে বই সাজানো, নিউমার্কেটেও বই-এর স্টল বংবেরংএর মলাটে ঝলমল করে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পার হতে না হতেই বই পাড়ার যে উত্তেজনা বাতাসেও অনুভব করা যায় তা আর কোথাও মিলবে না।

বই-পাড়া ও অঞ্চলটিতেও আগের চেয়ে অনেক ডালপালা মেলেছে। বড় রাস্তা যা সামলাতে পারেনি সে বেগ গলি ঘুঁজিতে কতদূর পর্যন্ত যে গড়িয়ে যাচ্ছে, কিছুদিন বাদে ঘুরে দেখতে গেলে অবাক হতে হয়। একতলার ঢেউ দোতলা পর্যন্ত মরিয়া হয়ে পৌঁছেছে। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ভেতরও চড়াও হয়ে চালডাল

মশলাপাতি বা অনুরূপ সংসারিক প্রয়োজনের টুকিটাকির দোকান বসেছে দখল করে।

কলেজ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের বই-পাড়ার মাধুর্য মহিমা রহস্য রোমাঞ্চ কিন্তু বড় ছোট ওই সাজানো দোকানগুলিকেই বোধহয় ঘিরে নেই। তার আসল আকর্ষণ ও উত্তেজনা ফুটপাথে এলোমেলোভাবে ছড়ানো কিংবা রেলিং-এর ধারে থাকে থাকে হেলানো। বই-পাড়ায় সেই হ'ল রূপকথার অরণ্য, যেখানে কোথায় কি বিস্ময় যে লুকিয়ে আছে কিছুই ঠিক নেই।

বলা বাহুল্য, এ অরণ্য পুরোন বই-এর। সেখানে একবার যে পা দিয়েছে তার নেশার ঘোর আর কাটবার নয়। ঘুরে ঘুরে তাকে আসতেই হবে সেখানে। ফুটপাথের ওপর উবু হয়ে বসে কি রেলিঙের ধারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো বই ওল্টাতেই হবে লুব্ধ চোখে। দরকারী কাজের সময় বয়ে যাবে, কি সংসারের যে ফরমাশ রাখতে বার হওয়া তা ভুল হয়ে যাবে, তবু পা দুটো সেখান থেকে নড়তে চাইবে না।

এ অরণ্যের কুহক যাঁদের মনে লাগেনি তাঁরা পরিহাস করে বলতে পারেন, কি এমন আছে পুরানো বই-এর গাদায়! যে কোনো বড় পাঠাগারে গেলেই ত পুরোন বই রাশি রাশি পাওয়া যায়। পয়সা দিয়ে কেনবারও দরকার হয় না। যত খুশি ঘেঁটে আশ মেটানো যায়।

হ্যাঁ বইও পাওয়া যায় রাশি রাশি, ঘাঁটাও যায় যত খুশি, কিন্তু আশ মেটানো যায় না।

সেখানে অজানা অরণ্যের সেই উত্তেজনাই যে নেই। ক্যাটালগে আদ্যাক্ষর ধরে তালিকা করে বই আরজি জানিয়ে পাওয়া, আর কলেজ স্ট্রীটের পুরোন বই-এর মায়া কাননে আচম্বিতে কোনো বই আবিষ্কার করা ত এক কথা নয়।

নির্দিষ্ট কোনো জানা শোনা সম্পদের আবিষ্কারও তা নয়। খুঁজে পাওয়া যেমন অতর্কিত, যা খুঁজে পাওয়া যায় তাও তেমনি হয়ত অভাবিত। বই-এর গাদার বিশৃঙ্খলাই সেখানে সবিস্ময় উত্তেজনার সহায়। চিকিৎসাশাস্ত্র কি পদার্থ বিদ্যার গুরুপাক ও সত্যিই গুরুভার কোন পাঠ্য বই-এর পেছনে কুণ্ঠিত করুণভাবে মলাট-ছেঁড়া দীন মলিন বেশে আশ্চর্য কোন হারানো রতন হয়ত লুকিয়ে আছে।

সে বই কিনি বা না কিনি, শুধু নেড়ে চেড়ে নয় বইওয়ালার সঙ্গে একটু দরদস্তুর করেও সুখ।

বই পাড়ার ছোট বড় সভ্য ভব্য পোশাকী সব দোকানে কেনাবেচার কোটালে বান ডাকে। বান ডাকে স্কুল-কলেজের নতুন বছর শুরু হওয়ার সময়ে আর বিয়ের মরশুমে।

ফুটপাথে কিন্তু জোয়ার ভাঁটাও নেই বললেই হয়। নেহাৎ বৃষ্টিবাদলে দুর্যোগে ছাড়া সারা বছরই সমান ঔৎসুক্যের প্রবাহ, লুব্ধ মুগ্ধজনের ভীড়।

এই ভীড়ের মধ্যে সেকাল-একালের গণ্য ও নগণ্য খুব কম সাহিত্যিকই বাদ পড়েছেন বলে আমার ধারণা। কলেজ স্ট্রীটে এসে ফুটপাথের বই-এর মোহিনী মায়া জয় করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন এমন জিতেন্দ্রিয় সাহিত্যিকের কথা ত' ভাবতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন জানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র বর্মা যাবার আগে, কি সেখান থেকে ফিরে শিবপুরে বাসা নেওয়ার পরে এই পথে যেতে কখনো কোথাও কি থমকে একবার দাঁড়ান নি ?

এই ফুটপাথে কবে কোন সাহিত্যিক বই ঘেঁটেছেন ও ঘাঁটেন, এই বই-এর পাড়ায় কোথায় কার গতিবিধি ছিল ও আছে সেসব কাহিনী জড় করলেই ত একটা জমজমাট ইতিহাস হয়।

সুদূর সাগরপারের ফ্লীট ষ্ট্রীটের গল্পে আমরা মশগুল হই, আমাদের এই বই-পাড়ার কাহিনী কি কম যায় মনোহারিত্বে!

সে সব কাহিনী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? যাঁরা নেই তাঁদের কিংবদন্তী আর যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের স্মৃতিকণা এই বই-পাড়াকে নিয়ে।

কত মজার খবরই না তাহলে পাওয়া যেতে পারে। ফুটপাথের ছড়ানো হাটে কোনো সাহিত্যিকের নিজের নতুন বই-ই হাতে লেখা সাগ্রহ উৎসর্গ সমেত আধা দামে বিকোতে দেখার খবরও হয়ত।

মজার খবর কিংবা যাঁরা সফল হয়েছেন স্বীকৃতি পেয়েছেন শুধু তাঁদের গল্পই ত নয়, এই বই-পাড়ায় ফুটপাথে সে সব ক্লান্ত ব্যথিত পায়ের অদৃশ্য ছাপ লেগে আছে, প্রকাশকের দোকানে দরজায় দরজায় ফেরা ব্যর্থ লেখকের যে হতাশার নিশ্বাস মিশে আছে এখানকার বাতাসে তাও বা ধরা থাকবে না কেন কোন আশ্চর্য কলমে!

বই-পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে ফুটপাথের যত রাজ্যের বই-এর ছড়াছড়ির মধ্যে কখনো কখনো একটা বিষণ্ণ উদ্বেগও মনে জাগে। অন্য যে ভাবেই ভাবি না কেন, মুদ্রিত ভাষার অনাবশ্যক অন্তহীন আবর্জনার দিকটাও ভুলতে পারি না। নগরের রাস্তায় ঘাটে পয়োনালীতে যেমন আমাদের আধুনিক যন্ত্রবাহন সভ্যতা তার পুঞ্জীভূত গ্লানি ছড়িয়ে রেখে যাচ্ছে নিরুপায় হয়ে, চিন্তা-ভাবনা-কল্পনার জগতে এও যেন কতকটা তেমান। মানুষের মনোলোকে দীপ জ্বালা চলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি আলো যেখানে জ্বলে সেখানে তার সঙ্গে না-জ্বলা কি জ্বলতে-গিয়ে-নেভা ভাঙা দীপের ময়লা ও কালির যেন অন্ত নেই। মুদ্রাযন্ত্র আমাদের আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অভিশাপও কি কিছু আনে নি,—আগাছার জমির অবাধ

উর্বরতায় আসল ফসল হারিয়ে যাবার অভিশাপ? আধুনিক যুগের কীর্তি অনেক, কিন্তু পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, মাটি, জল সভ্যতার ক্লেদে নোংরা করার নালিশও তার বিরুদ্ধে মহাকালের দরবারে জমা হচ্ছে। পারমাণবিক পরমার্থ লাভের তপস্যায় পাপের যে বিষ বর্জিত ও সঞ্চিত হচ্ছে, নব নীলকণ্ঠের আবির্ভাব না হলে, তা নিরাপদে ধারণ করবার মত জায়গা পৃথিবীর স্থলে জলে নেই বলে শুনি।

সে রকম বিষ না হোক মনের জগতেও মুদ্রাযন্ত্রের আশীর্বাদের অপচয়ে নিরর্থক জঞ্জালে দিগ্বিদিক ছেয়ে যাচ্ছে কি না ভাবনা হয়। বই-পাড়ার মুদ্রিত কোলাহলের দিশাহারা হাটে কি যেন একটা খুঁজতে এসে ভুলে যাওয়ার অস্বস্তি তাই কিছুতেই ঘুচতে চায় না।

বন্ধুর ঘরে গিয়ে ঢুকে সেদিন বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে রইলাম।

বন্ধুর এই বসবার শোবার ও কাজ করবার সম্মিলিত ঘরটি কলকাতার মধ্যবিত্ত অপরিসরতার দৃষ্টিতে ঈর্ষা করবার মত বেশ প্রশস্তই বলা যায়। এই ঘরের একটি কোণে ফোনের রিসিভারটি কানে লাগিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে তিনি নীরবে বসে আছেন দেখলাম।

'এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট কাটল। বন্ধু তখনও এক ভাবে ফোন কানে দিয়ে বসে আছেন। কোন সম্ভাষণ নেই তাঁর কণ্ঠে। অপর পক্ষের বাক্যস্রোতে মগ্ন হয়ে আছেন মনে করব এমন একটু হাঁ হুঁ-ও তাঁর মুখে শোনা যাচ্ছে না। বন্ধু আর যাই হ'ন ধৈর্যশীল কি মিতভাষী মোটেই নন বলে জানি, সুতরাং ফোনের অপর প্রান্তে কারুর দীর্ঘ আলাপ এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে তাঁর পক্ষে শুনে যাওয়া কল্পনাতীত। ওপারের তড়িৎবাহিত কণ্ঠস্বরের যে বিকৃত আভাসটুকু আমার পাওয়ার কথা নাতিদূরে দাঁড়িয়ে তাও পেলাম না।

বন্ধু তাহলে করছেন কি ?

অনেক রকম উদ্ভট বিলাস মানুষের থাকে, কিন্তু বাক্য বিনিময় ছাড়াই ফোনের রিসিভার কানে এঁটে বসে থাকায় আনন্দ পাওয়ার কথা ত কখনও শুনি নি!

রহস্যের মীমাংসা হ'তে খুব দেরী হ'ল না। বন্ধু হঠাৎ যেন একটু অতিরিক্ত জোর দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ফিরে বললেন, কখন এলে ? বোসো।

সম্ভাষণটা সাদরই ভাবা উচিত কিন্তু মনে হ'ল বন্ধু মুখে স্বাগত জানালেও আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে তখনো ঠিক সচেতন নন।

বন্ধুর কাছেই একটা আসন সংগ্রহ করে তাই একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপার কি বলো ত ? তোমার নিষ্ফল আম

গাছের সাধনা জানি, বন্যতা স্মরণ করিয়ে রাখবার বলিষ্ঠ লতাটিকেও রোজ দেখি, কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক ফোন-বিলাসটা'ত বুঝতে পারলাম না। চাকতি ঘুরিয়ে ফোনের যে দ্বিবিধ যন্ত্রধ্বনি পাই, মশগুল হবার মত মধুর তার কোনটিকে ত মনে হয় না।

বন্ধু এতক্ষণে একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—নিরানব্বুই-এর ধাক্কায় কখনো পড়েছ ?

আমার বিমূঢ়তাটুকু উপভোগ করে নিজেই এবার বিস্তারিত করে বললেন,—অন্য এক রকম নিরানব্বুই-এর ধাক্কা একে বলতে পারো। ফোন গাইডে দেখে থাকবে কয়েকটি ব্যাপারে সহায়তা পেতে সাতানব্বই আটানব্বই কি নিরানব্বই ডায়াল করার নির্দেশ দেওয়া আছে। আপাতত সেই নিরানব্বই-এর শরণার্থী হয়েছিলাম।

তারপর ?

তারপর ওপারের যন্ত্রধ্বনি নিয়মিত ছন্দে সুদীর্ঘকাল ধরে বেজে যাওয়াতে ভাবিত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রেখেছি।

ভাবিত ?

হ্যাঁ টেলিফোন অফিসেই কোন নিদারুণ দুর্ঘটনা হয়েছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। যাঁরা উৎকর্ণ মূর্তিমতী কর্তব্যনিষ্ঠা, সেই শ্রুতি-শোভনারা নইলে গেলেন কোথায়! কর্ণাভরণ যন্ত্র নিয়ে নিবিষ্ট মনে যাঁদের আর্তত্রাণে বসে থাকবার কথা মিনিটের পর মিনিট তাঁদের যদি সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে অভাবিত আকস্মিক কোন দৈব দুর্যোগে টেলিফোনের যন্ত্রাগার শূন্য করে ধ্বনিসেবিকারা সব নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

হেসে ফেলে এবার বললাম, এসব ঠাট্টা করে আর লাভ কি ? স্বয়ংক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও টেলিফোনের অপবাদ যে ঘোচবার নয় তাত জানো।

জানি। বন্ধু এবার গম্ভীর হয়ে বললেন,—আর জানি বলে ঠাট্টা

যা করি তা শুধু ওদের নয়, নিজেদেরও! করুণ মর্মান্তিক ঠাট্টা। তুমি ত কাগজে-টাগজে লিখে থাকো। নিরেনব্বুই-এর ওই মেয়েটিকে নিয়ে একটা সত্যি গল্প লিখতে পারো?

সত্যি গল্প? মেয়েটিকে তুমি জানো নাকি?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

না জানি না। চোখেও কখনো দেখিনি। রিসিভারের পর্দায় ওই যন্ত্রাগার থেকে যাঁদের সুমধুর কণ্ঠ মাঝে মাঝে শুনেছি তাঁদের কাউকেই চিনি না কখনও দেখিনি। কিন্তু গল্পটা তবু সত্যি। শুধু ওঁদের পক্ষে নয় আমাদের সকলের পক্ষে।

গল্পটা কিরকম? —হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

গল্পের সারটুকু শুধু তোমায় বলতে পারি, বাকিটা তোমায় ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতে হবে। টেলিফোনের জরুরী ডাকে যে কর্ণপাত করতে চায়না সেই মেয়েটিই মনে করো হাসপাতালে তার ছোট ভাইকে কোন কঠিন অসুখের জন্যে ভর্তি করাতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা ঔদাসীন্যে অসৌজন্যে দায়িত্বহীনতায় উত্যক্ত ও হয়রান হয়ে সমস্ত পৃথিবীর ওপব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাসপাতালের যে কর্মচারীটি তার এই দুর্দশার জন্যে প্রধানত দায়ী তিনি বাড়ির সামনে ড্রেন বন্ধ হয়ে নোংরা জলে রাস্তা ভেসে যাওয়ার প্রতিকার করতে করপোরেশনের ওয়ার্ড অফিসে খবর পাঠিয়ে নিজে গিয়ে কোন সুরাহা না করতে পেরে বিভাগীয় বড় কোন অফিসারকে ফোন করতে গিয়ে আধ ঘন্টাটাক ফোন বাজবার পর কোন বেয়ারার কাছে শোনেন, বড় সাহেব লাঞ্চে গেছেন এবং বেলা চারটার আগে তাঁর ফেরবার সম্ভাবনা নেই। বেলা চারটার একটু বাদে ফোন করে তিনি জানতে পারেন বড় সাহেব অফিসে এসে জরুরী কাজে আবার বেরিয়ে গেছেন। করপোরেশনের সেই বড় সাহেব শেষ মুহূর্তে যাত্রা-নাকচ-করা টিকিটের দাম ফেরৎ পেতে মাসের পর মাস

রেলওয়ে অফিসে চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে রেল দপ্তরের আঠারো তুগুনে ছত্রিশ মাসে বছর সম্বন্ধে কারণে অকারণে গায়ের ঝাল ঝাড়েন। দপ্তরের যে কেরানীবাবু কিঞ্চিৎ কৃপা করলে ব্যাপারটা আর একটু তাড়াতাড়ি চুকতে পারত, তিনি পরাধীনতার যুগে দেশসেবার জন্যে উৎপীড়িত উদ্বাস্তু কর্মী হিসেবে মাথা গোঁজবার একটা যেমন তেমন ঠাঁই যোগাড় করতে এ বিষয়ে বরাদ্দ সরকারী সাহায্যের আশায় নির্দিষ্ট দপ্তরে লেখালেখি হাঁটাহাঁটি করে দপ্তর-ওয়ালাদের তাচ্ছিল্য গড়িমসি ও গাফিলতিতে নাকের জলে চোখের জলে ভাসেন। ভুল খবরে ও গাফিলতিতে উক্ত কেরানী বাবুর নাজেহাল হওয়ার যিনি একরকম মূল সেই কর্মচারী ভদ্রলোক ডাক্তারকে জরুরী খবর দেবার জন্যে অত্যন্ত দরকারী একটা ফোনের নম্বর এক ঘণ্টা ধরে নাগাড়ে চেষ্টা করে ধরতে না পেরে ওই নিরানব্বুই-এর মধুর যন্ত্রধ্বনি শুনতে শুনতে মাথার চুল ছেঁড়েন।

এই পাপচক্রে আমরা সবাই বাঁধা এইত বলতে চাও।

শুধু তাই নয় বলতে চাই এ চক্র আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানে অজ্ঞানে ঘোরাতে সাহায্য করছি আর কি দাম যে তার জন্য দিচ্ছি তার হিসেব রাখছি না। মেনন সাহেব সেদিন মাথাপিছু আড়াই ঘণ্টা মাত্র কাজ হওয়ার কথা বলেছেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সমস্ত ভারতবর্ষই দিনে আড়াই ঘণ্টা কাজের চাকায় কোনমতে কেঁদে কঁকিয়ে ঘুরছে। ফাঁকি দিযে এক গুণ জিতে তার গুনোগার দিচ্ছি দশগুণ। কৃষি দপ্তরের কাজের ফাঁকির শোধ তুলছে বাণিজ্য শিল্প। তাদের ফাঁকির সুদে আসলে খেসারৎ দিতে হচ্ছে স্বাস্থ্য কি শিক্ষাকে! এও সেই উৎকোচ-বৃত্তের আপাত মধুর আত্মনিধন। সিমেণ্টে যে ঘুস নেয় শুধু নিজের বাড়ির নক্সা মঞ্জুর করাতেই তার পকেট ফাঁক। আদাগাতের উপরি যায় ওষুধের কালোবাজারে। অর্থাৎ উৎপাতের কড়িতে সারা দেশ চিৎপাতের নাভিশ্বাস তুলছে।

গম্ভীর হবার চেষ্টা করেই বললাম,—প্রতিকারের উপায় কিছু ভেবেছ ?

ভেবেছি। বন্ধুর চোখে একটু কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল কিনা বুঝতে পারলাম না। বললেন—উপায় তুমি আর আমি। হ্যাঁ, তোমাতে আমাতে মিলেই একটা গুপ্ত সংশপ্তক দলের আখড়ার প্রথম নাড়া বাঁধতে হবে। আর একটা রবার স্ট্যাম্প কি আলু হলেও চলবে।

আলু ?

হ্যাঁ আলুর আধখানা কেটে দোলের রংখেলার দিনে যেমন, তেমনি একটা উল্টো লেখা ছাপ তৈরী করে নেবো। জামার পিঠে মারলেই যা ফুটে উঠবে তা হ'ল 'চোর'। যেখানে দেখবে ফাঁকি যেখানে চুরি সেখানে মরিয়া হয়ে পয়সা পদ প্রতিপত্তি সব অগ্রাহ্য করে অকুতোভয়ে এই ছাপ মারতে হবে দিনের পর দিন। যে শাস্তিই তাতে হয় হোক।

বন্ধুর কথা শেষ হতে না হতেই ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। মুখ চোখ কেমন কাঁচুমাচু করে তিনি তাড়াতাড়ি ফোনের কাছ থেকে উঠে এসে বললেন—ফোনটা একটু ধরো'ত হে।

ব্যাপারটা না বুঝলেও ফোন ধরতে হল। অপর পক্ষের কথা শুনে ফোনে হাত চাপা দিয়ে বললাম—কোন একটা কোম্পানী থেকে ফোন করছে তোমায়। নামটা ধরতে পারলাম না। কাল তোমার কি কাজ নাকি শেষ করবার কথা ছিল বলছে।

বন্ধু চুপি চুপি বললেন—বলে দাও বাড়ি নেই।

অগত্যা সেই জলজ্যান্ত মিথ্যাটাই অম্লান বদনে জানাতে হ'ল। ফোন নামিয়ে ফেরবার আগেই বন্ধু নিজে থেকেই বললেন,—আলু আর একটা ছুরি তাহলে এখনি'ত আনাতে হয়। কালি এখানেই আছে।

কদিন আগে এক মুশায়েরা অর্থাৎ কবিসভায় যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঘরবন্দী ছোটখাট কবিদের জটলা নয়। প্রায় মুক্ত প্রান্তরের কবিসভাই বলা চলে। কবিদের জন্যে একটা অস্থায়ী উঁচু মঞ্চ ছিল বটে, মাথার ওপর কোনরকম একটা আচ্ছাদনও কিন্তু শ্রোতারা মাঠের ওপরই বসেছিলেন মুক্ত আকাশের নিচে ছড়িয়ে। প্রায় জন পঞ্চাশ কবির—তাদের মধ্যে আবার দুজন বিদেশী বীটনিক টহলদার—নিজস্ব কণ্ঠের আবৃত্তি সেদিন নিদাঘের প্রথম রাত্রিকে স্পন্দিত করেছে।

কবিসভার শেষে বেশ একটা মধুর চাঞ্চল্যের আমেজ নিয়েই বাড়ি ফিরতে পারতাম কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে মনের সুরটা ঠিক অক্ষুণ্ণ থাকতে দেয় নি।

কবি সভায় যাবার পথে প্রথম ঘটনাটাই উল্লেখ করবার মত। যেখানে কবিসভা বসবার কথা সেখানে তখন সবেমাত্র একটি গানের আসর শেষ হয়েছে শুনলাম। দলে দলে পঙ্গপালের মত মানুষ সেদিক থেকে ফিরছে। আসরভাঙার পর ভীড় সরে যাওয়ায় এ দৃশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে জনস্রোতের মধ্যে এমন একটু শঙ্কিত ব্যগ্রতার লক্ষণ ছিল যা কৌতূহল জাগাবার মত।

গ্রীষ্মের অবসাদগাঢ় প্রশান্ত নির্মেঘ সন্ধ্যা। নইলে বায়ু কোণে কালবৈশাখীর ভ্রূকুটি এ ত্রস্ত অপসরণের কারণ হিসাবে ভাবতে পারতাম। জনতার দ্রুত ব্যাকুল পদক্ষেপে সেই ধরনের একটা আপদ এড়াবার অস্থিরতাই ছিল। সহযাত্রী সভাসদ একজন কবি ব্যাপারটার নিপুণ বর্ণনা দিয়ে বললেন,—ওদিকে যেন 'ফ্লিট' দিয়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ 'ফ্লিট'ই দিয়েছে একরকম। তাঁর অন্য এক কবিবন্ধু ব্যাখ্যা

করলেন,—কিন্তু কীটাতঙ্ক পিচকারীর কাজটা কিসে হয়েছে জানো? যে আসর সমাপ্ত হল তার শেষে স্রেফ একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা,—এইবার এখানে আধুনিক কবিসভা বসবে, কবিরা স্বকণ্ঠে তাঁদের আবৃত্তি শোনাবেন। ব্যস্ ওই একটি ঘোষণা শুনেই মাঠ ফাঁক।

পরিহাস করে বললেও কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আগের আসরে মাঠে যেখানে তিলধারণের জায়গা ছিল না সেখানে আধুনিক কবিদের সোচ্চার কবিতা শুনতে ছাড়াছাড়ি ভাবে দু-দশটি করে শ্রোতা আমরা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে বসেছি। কবিদের আবৃত্তির শেষে করতালিধ্বনির হ্রাস-বৃদ্ধিতে মনে হয়েছে কবিতার উৎকর্ষের চেয়ে আবৃত্তির স্থূল আস্ফালনই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছে বেশী। এদিকে-ওদিকে দু-একজনের মন্তব্য যা কানে এসেছে তাতে উপহাসের আভাসও পাইনি এমন নয়।

আধুনিক কবিতার বিচারক হবার স্পর্ধা আমার নেই কিন্তু সে রাত্রের সেই খোলা-মাঠের কবিসভায় যে সব কবিতা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল তার কোনটিই উপেক্ষা বা বিদ্রূপ করবার মত বলে আমার মনে হয়নি। চেষ্টাকৃত যে দুর্বোধ্যতা এক সময়ে বাংলার অল্পবিস্তর বহু কবিকে হুজুগে মাতিয়েছিল তার আধিপত্যও বর্তমান কবিদের ওপর প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলতে দ্বিধা নেই। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কবিকুল ও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে সাধারণের অবজ্ঞা না হোক ব্যাপক ঔদাসীন্যের কারণ কি ভাবতে ভাবতেই সেদিন কবিসভা থেকে ফিরেছি।

এ সমস্যা শুধু বাংলা কাব্যের নয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলিতেও কাব্যের এই বিচিত্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে শুনি। কবিতার চর্চা ও কবির সংখ্যা যে অনুপাতে বেড়েছে সাধারণ পাঠক-সমাজের কাব্য সম্বন্ধে অনাসক্তিও সেই পরিমাণে।

আধুনিক কবিরাই অক্ষম আর তাঁদের কবিতা বেশীর ভাগই

অর্থহীন প্রলাপ, এই চলতি মামুলি, সাধারণের মন ভোলানো যুক্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলে ভাবনা ছিল না। কবিতার আধুনিক যুগকেই এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে নিশ্চিত মনে তাহলে বিষয়ান্তরে মন দেওয়া যেত। কিন্তু এ যুক্তি মেনে নিতে নানা দিকেই বাধে। কবিতার নামে ফাঁকি চৌর্য ও অনাচার বর্তমানে নেই এমন নয়। সব যুগেই থাকে। কিন্তু ঐহিক আশু কোনো লাভের আশা ছাড়াই যাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন বর্তমানের সেই সমস্ত কবিসমাজকেই বাতুল বলে বাতিল করা কোনো সুস্থ বিচারে সম্ভব নয়। অভ্রভেদী প্রতিভা না দেখা দিক কবিতায় নব নব উন্মেষ এখনো বিরল নয় একেবারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিসভায় যাবার জন্যে দলে দলে মানুষ যে উন্মুখ হয়ে ওঠে না এ সত্য ত অস্বীকার করবার নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু এই সভায় নজরুল ইসলামের মত কোনো কবির উপস্থিতি কি ফাঁকা মাঠ অচিরে ভরিয়ে তুলত না? কবিপ্রতিভা ছাড়া বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বও অবশ্য সে জনপ্রিয়তার অনেকখানি সহায় জানি, তবু শুধু তারই অভাবের মধ্যে নয়, কাব্যরসাস্বাদে বর্তমানের ব্যাপক অনাসক্তির মূল অন্যত্র সন্ধান করতে হবে বলে মনে হয়। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার ওপরও সব অপরাধ চাপিয়ে আসল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আধুনিক কবিরা সত্য কথা বলতে গেলে দুর্বোধ্য নন, দুরূহ। শুধু কান পেতে রাখলেই যা মর্মে গিয়ে ঢোকে সেই সরল তরলতা তাঁদের সাধনা নয়। দেশী-বিদেশী আধুনিক কাব্যাদর্শের কূটতর্ক বাদ দিয়েই এটুকু বলা যায় যে, মানুষের মনের ভাবনা অনুভূতি উপলব্ধিই অনিবার্য কারণে আজ জটিল স্ববিরোধে বিক্ষুব্ধ। কাব্য এবং তার প্রকাশেও তাই একান্ত সহজ স্বচ্ছতা যদি অনুপস্থিত

থাকে তাহলে কবিদের ক্ষমতার তারতম্য যাই থাকুক তাঁদের সততা সম্বন্ধে অন্তত সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

কবিতা আজ একেবারে অনাদৃত এমন কথা বলছি না, কিন্তু জনসমাদর বলতে যা বুঝি, সৎ ও যুগ-সত্যের সন্ধানী হয়েও তা যদি কবিদের ভাগ্যে না জোটে তাহলে এ উপেক্ষা লাভ তাঁদেরই কর্মফল বলে সিদ্ধান্ত করার আগে পাঠক সাধারণের রস-গ্রাহিতার মানও বিচার করে দেখা যায় না কি?

এ যুগের কবিতার সঙ্গে জনসাধারণের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে তার জন্যে দায়ী কবিদের নিরর্থক দুর্গমতায় আত্মনির্বাসন না জনসাধারণেরই রুচি ও রসবোধের জড়তা ও অধঃপতন এ প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হলে অপ্রিয় সত্যকে অস্বীকার করা চলবে না।

বর্তমান সভ্যতার নানা অসামান্য কীর্তি সত্ত্বেও তার অভিশাপের দিকটাও উহ্য রাখবার নয়। মানুষকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেবার উৎসাহে যে ধরনের স্থূল সমীকরণের উদ্যোগ সর্বত্র এখন চলেছে ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যের তা বিরোধী। আধুনিক গান বলতে যে বিচিত্র বস্তুটি আমাদের দেশেই আজ জনপ্রিয়তায় অদ্বিতীয়, তার রচনা ও সুরের বাহারকে যদি এই সমীকরণের অন্যতম ফল মনে করি তাহলে সেকালের বা একালের কবিতার অনাদরে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

আসল কথা সাময়িক কোনো রাজনৈতিক মতবাদের আওতায় পড়ে কবিরা জন-সংযোগের যে ধুয়া তোলেন তা একান্ত অসার ও ভ্রান্ত কি না ভেবে দেখা দরকার।

জনতা ও নির্জনতার আরাধনা এক সঙ্গে কাব্যে চলে না। কবির পক্ষে জন-সংযোগ নিশ্চয়ই অপরিহার্য, কিন্তু সে সংযোগ জনে জনে পৃথকভাবে নির্জনতার সঙ্গে আরেক নির্জনতার, এ যুগের খোলা মাঠের কবিসভায় যা অলভ্য।

আধুনিক কবিতা ও এ যুগের সাধারণ পাঠকদের রুচি ও রসবোধের কথা বলতে গিয়ে নিজের অগোচরে পাল্লার একদিকে একটু বেশী পাষাণ চাপিয়ে ফেলেছি বলে' সন্দেহ হচ্ছে। সাধারণ পাঠক বর্তমান কালের কবিতার প্রতি বিমুখ কিংবা উদাসীন সন্দেহ নেই। সে বিমুখতা ও ঔদাসীন্যের মূলে যান্ত্রিক স্থূল সমীকরণের যুগের অন্যতম গ্লানিস্বরূপ মনের রুচি-বিকার ও অসাড়তা অনেকখানি অবশ্যই আছে, কিন্তু আধুনিক কবিতাকেও এ বিষয়ে একেবারে নির্দোষ মনে করা যায় কি? কবিতার নামে প্রলাপ পরিবেশনের মাত্রাধিক্য কবি ও পাঠকদের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়াতে যে সাহায্য করছে এ সত্যও একেবার অস্বীকার করবার নয়।

ভাষার ওপর যথেচ্ছ উপদ্রবই যাঁরা কবিতা বলে চালাতে চান তাঁদের কিন্তু সাবধান হবার সময় এসেছে। না, পাঠক সাধারণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে তাঁদের ওপর সমবেতভাবে চড়াও হবে এমন আশঙ্কার কথা বলছি না। প্রলাপী কবিদের বিপদ আসছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। তথাকথিত আধুনিক কবিতার জারিজুরি যা ভেঙে দেবে বলে মনে হয় তা এতদিন গোকুলে গোপনে বেড়ে উঠে এইবার সবে গলা বাড়াতে শুরু করেছে।

বুনো ওলের ওপর বাঘা তেঁতুলের মত প্রলাপী কবিতার ওপর এককাঠি সরেস এই কবিতার দুটি নমুনা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

প্রথম নমুনাটি এই—

সব মেয়েরাই ফোঁপায়
যেন মন্থর তুষার।
কেদারার কাছে ওই মেয়েটা কাঁদবে না।

হোঁচট খাও, গোঁয়াও, যাও,

ওই মেয়েটা দিতে পারে কি ?

ডেস্কে সাগর পাড়ি।

এই মেয়েটা বোবা এবং কোমল।

এই নমুনা দেখে যাঁদের চক্ষু চড়ক গাছ হয়েছে, তাঁদের দ্বিতীয়টি আর পড়বার দরকার নেই, তবু কবিতার ব্যাপারে ইট-পাটকেল লোহাও যাঁরা অকাতরে হজম করে ফেলেন তাঁদের জন্যে দ্বিতীয় নমুনাটিও দিতে হচ্ছে।

সঙ্কীর্ণ হাসির মত খুব কম আঙুলই চলে।

কান কখনও কটা মাছ রাখবে না।

ও অন্ধ ঘরে গোলাপ ফুলটা কে?

তনুদেহ সব অন্ধ করুণাময়

প্লেনগুলো আসছে.

একটি গোলাপ

বেয়ে তারা কাঁদে বিশ্রী।

ঝাঁপ দেওয়াটা গুমোটভরা,

হামাগুড়ি দেওয়া ছিল মমতাময়।

কবিতার এই নমুনা দুটি থেকে গভীর তাৎপর্য ও ব্যঙ্গ্যার্থ টেনে বার করবার মত ধুরন্ধর বিচক্ষণ আধুনিক সমালোচকের অভাব হবে না জানি। এক ঝুড়ি বচন আউড়ে উদ্ভট সব নামের ফিরিস্তিতে চক্ষুস্থির করে দিয়ে তাঁরা অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবেন ও কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের মনের তমসাবৃত নির্জ্ঞানের গহন অরণ্য-শাখা থেকে ছিঁড়ে আনা বিস্ময়। যেমন, গোলাপ হ'ল মানুষের প্রেম, অন্ধ যান্ত্রিকতার কারাগারে শ্বাস যার রুদ্ধ। তনুদেহ প্লেন আনছে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের বার্তা। সে বার্তায় ভয়ার্ত মানব সন্তানের স্বতস্ফূর্ত আনন্দ শুকিয়ে সঙ্কীর্ণ হাসি হয়েছে আর স্মরণ

করছে সে হারানো মধুর শৈশব, হামাগুড়ি দেওয়া যখন ছিল মমতাময়।

ব্যাখ্যা যত ভালোই দিয়ে থাকি কবিতা দুটি কিন্তু আমার লেখা বা বানানো নয়। অতিমানবিক প্রতিভা না থাকলে এ রচনা যে কোনো কবির সাধ্যাতীত। এ কবিতা যে মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে, তার বিবরণ শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হবে। কবিতা দুটির রচয়িতার মোট শব্দসম্পদ মাত্র সাড়ে তিন হাজার শব্দ। মাত্র একশ আটাশটির বেশী সরল বাক্য গঠন প্রণালী এ কবির জানা নেই। এই পুঁজি নিয়েই যে কবির মাথা থেকে ঘণ্টায় অমন একশ কবিতা বেরুতে পারে, কাব্যকলা সম্বন্ধে তাঁর শ্রীমুখের বাণী শোনার জন্যে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে আগ্রহ দুঃখের বিষয় মেটাবার নয়।

কারণ এ সব অনন্য কবিতার রচয়িতা কোনো মানবসন্তান নয়, একটি অসামান্য যন্ত্র-মস্তিষ্ক, গণনার বদলে রচনাই যার বিশেষত্ব। সম্প্রতি আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়ায় এই কবি-কল্কি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

কাব্য জগতে এই যন্ত্র-প্রতিভার আবির্ভাবে কি যুগান্তর যে আসছে তা আমাদের মানবিক কল্পনায় অনুমান করা কঠিন। এই নতুন কলের কবিতার আমদানীতে যাঁদের অন্ন মারা যাবার সম্ভাবনা, তাঁদের পক্ষে একটি মাত্র ভরসা এখনো এই যে, এসব কবির আবির্ভাব প্রাদুর্ভাবে পরিণত হবার বেশ একটু বাধা আছে। বাধাটা আর্থিক।

একটি এমন যন্ত্রপ্রতিভার খরচ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা!

দুর্বোধ্য ও অবোধ্য যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক সুস্থ ও বিকৃত আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গ থেকে একটা ব্যাপার হঠাৎ যেন আবিষ্কার করে বিস্মিত হচ্ছি। আধুনিক কবিতার স্বপক্ষে নানা মুনি ও মত থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মতান্তরের যথেষ্ট প্রাণ খোলা পরিচয় কি

সাহিত্যে বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে? পাঠক সাধারণের ঔদাসীন্য তবু মেনে নেওয়া যায় কিন্তু রসিক বোদ্ধা সমালোচকদের কলম যে পক্ষেই হোক যদি শাণিত তীব্র না হয়ে ক্লান্ত নিস্তেজ হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান সাহিত্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই যেন একটু সন্দেহ জাগে। বাংলা সাহিত্যে সেই রকম একটা নির্জীব শান্তিই এখন বিরাজমান কি না নিজেকে প্রশ্ন না করে পারছি না।

বলতে পারা যায় যে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সমালোচকরা গাল পেড়ে পেড়ে হার মেনেছেন, আর সমর্থকরা নিজেদের উন্নাসিকতায় কানে তুলো দিয়ে বসে আছেন, যাঁদের তাঁরা অর্বাচীন মূঢ় ছাড়া কিছু মনে করেন না তাঁদের কটু কাটব্যে নির্বিকার হয়ে। কিন্তু গত কয়েক বছরের পত্র-পত্রিকার নির্ঘণ্ট মনে মনে আউড়ে সে রকম রক্তারক্তি দূরে থাক মনের মত চোখ রাঙানির দৃষ্টান্ত স্মরণ করতে না পেরে সন্দেহ হচ্ছে কবিতার উভয় পক্ষই হয়ত রক্তাল্পতায় ভুগছেন।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, গালমন্দ মারামারি কাটাকাটির অভাব সভ্যতা ভব্যতার লক্ষণ ভেবে যাঁরা খুশি থাকেন তাঁদের দলে আমি থাকতে একটু কুণ্ঠিত। প্রাণের বেগ তট বা তীরের বাধায় উদ্দাম ফেনায়িত না হয়ে উঠে পারে না। জীবন্ত সাহিত্যে তর্কের আবর্ত কি তুফানও তাই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে আমার ধারণা। প্যারিসের কোন কোন কাফেতে সাহিত্য শিল্প নিয়ে দলগত খণ্ডযুদ্ধ অহরহ চলে বলে শুনি। আমাদের কলকাতার কফি হাউস কি চায়ের দোকানে সে রকম মতবিরোধের বাচনিক দাঙ্গা একটু আধটু হয়ত বাধে, কিন্তু সাহিত্যে তার কলরব কিছুকাল থেকে যেন স্তিমিত হয়ে আসছে বলে আশঙ্কা হয়। আসল কথা কলমকে হাতিয়ারের মত চালনা করবার নিপুণ ও সাহসী যোদ্ধারাই ক্রমশ বিরল হয়ে আসছেন। এই যদি আমাদের সভ্য ভব্য হয়ে ওঠার প্রমাণ হয় তাহলে এ সভ্যতা ভব্যতার

নিস্তরঙ্গ কৃত্রিম নির্মলতার চেয়ে জীবন্ত ঘোলাটে বেগ অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় না বলে পারা যায় না। একজন সমাজপতি, কি তার চেয়েও বেশী একজন মোহিতলাল যত একদেশদর্শী অসহিষ্ণু ও আত্মমতান্ধই হোন, সাহিত্যে সুস্থ উত্তেজনার জোয়ার তাঁরাই তাঁদের ধিক্কারে চীৎকারে প্রবাহিত রাখেন। তাঁদের গোঁড়ামির নির্ভীক প্রচণ্ডতাই নতুন স্রোতকে সকল বাধা জয় করবার বেগ দেয়।

শুধু সাহিত্যে নয় আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও মৌন নির্বিরোধিতা কোন মহৎ গুণ বোধ হয় নয়। মাঝে মাঝে আশ মিটিয়ে মুখ না ছোটালে বুকের গভীরে অনেক দামী কিছু ফাটবার সম্ভাবনা। জাপানী ভাষায় গালমন্দ গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা সমস্ত জাতি সম্বন্ধেই অকারণে ভাবিত হয়ে ওঠেননি। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার নামজাদা চিকিৎসক ডাঃ হেরন আধুনিক আবাসের পাতলা দেওয়ালই এ যুগের বহু মানসিক ব্যাধির মূল বলে যে রায় দিয়েছেন সেটা নেহাৎ পরিহাস নয়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া পাছে প্রতিবেশীর কাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে ভব্যতার খাতিরে মুখ বুজে রাগ বিরক্তি ক্ষোভ চাপা, পরিবারের সকলের মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, সাহিত্যের কৃত্রিম সৌজন্যের দেঁতো হাসিও তেমনি। কলম কি শুধু কাগজের ওপর আলতোভাবে বুলোবার জন্যে? মাঝে মাঝে শক্ত খোঁচা দেবার জন্যেই বা নয় কেন? আর কিছু না হোক নিজের মনের বিষ ত খানিকটা তাতে ঝরে যায়।

হাওয়া অফিসের গণনা এবার অপ্রত্যাশিতভাবে ফলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কালাপানি পেরিয়ে মৌসুমী বর্ষা সত্যিই বাংলা দেশের আকাশের দুঃসহ দাহ মেঘের প্রলেপে মুছে দিয়েছে। আর সে কালবোশেখীর আচমকা হানা দেওয়া নয়, নিরবচ্ছিন্ন মেঘ-মেদুরতা তার বদলে। তারই সঙ্গে স্তিমিত আলো আর অনিশ্চিত বর্ষণের আথান্তর।

ওপরের পংক্তির শেষে আথান্তর শব্দটা যদি একটু বেসুরোভাবে কারুর কানে খট্ করে বেজে থাকে তাহলে আশ্চর্য আমি হব না, দুঃখিতও নয়। নিজের কানেও ও শব্দটির খট্কা আমি টের পাই নি এমন নয়। কিন্তু বর্ষণের পর কলম থামিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে শেষ পর্যন্ত ওই আথান্তরের মধ্যেই আটকে গেছি।

শহুরে প্রকৃতি সব সময়েই অবশ্য একটু বেমানান বেসুর। 'নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া হানি দীর্ঘ ধারা' যে বর্ষা গিরি প্রান্তর অরণ্যে মহিমাময়, শহরে তার আবির্ভাব একটু অপ্রস্তুত ও কুণ্ঠিত গোছের মনে হতে পারে। দিক্চক্রবাল কলের চিমনি আর বেঢপ অট্টালিকা-শীর্ষে ক্ষত-বিক্ষত বলে বর্ষার দিগন্তব্যাপী মেঘের সে গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিন্তু সে মহিমা-চ্যুতির সঙ্গে আথান্তরের কোন সম্পর্ক নেই।

অনিশ্চিৎ বর্ষণের কাব্যময়তা কেন ওই অন্ত্যজ শব্দে হোঁচট খেয়ে থামে কবি-অকবি কাউকেই তা বুঝিয়ে বলার দরকার বোধ হয় হবে না। নাগরিকতা যখন কিছুতেই বর্জন করবার নয়, তখন অন্য আরো অনেক কিছুর মত প্রকৃতির ভেজালটুকু মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে আমাদের শিখতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাণ আই ঢাই, গ্রীষ্মের পর বর্ষণস্নিগ্ধতার প্রতিশ্রুতি পেয়েও পুরোপুরি খুশি হতে পারছি কই!

পারছি না শুধু সর্দি কি ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয়ে কিংবা ওয়াটার প্রুফ কেনা কি সারানোর দুর্ভাবনায় নয় বছরের পর বছর অনিশ্চিৎ বর্ষণের আনুসঙ্গিক একটি করুণার জ্বালা হাড়ে হাড়ে ভোগ করে।

আপনি দক্ষিণেই থাকুন কি উত্তরে, শহরের একেবারে মাঝখানে কি প্রান্তে, বর্ষণ নামলেই বিধাতা আপনাকে উভচর না করবার জন্যে একটু আফ্‌শোস না করে পারবেন না। কারণ বর্ষার কলকাতা আর আপনার সেই চেনা শহর নয়। কলকাতা শুনেছি আদিম জলার ওপর গড়ে উঠেছে। সে আদিম জলা যে অনন্তও বটে বর্ষা নামলেই তা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে মানুষের মত ভূখণ্ডেরও প্রেতযোনী আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াকার সেই জলা-বাদা যেন প্রতি প্রাবৃটে তাদের পুরানো দখল দাবি করতে এ নগরে হানা দেয় মনে হবে।

ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন কলকাতাকে জলে স্থলে দিশাহারা আথান্তরী করবার জন্যে তুমুল বৃষ্টিতে তাকে ভাসাবার দরকার আর হয় না। এমন আশ্চর্য কৌশলে এ শহর আমাদের তৈরি যে আকাশ একটু ছিটেফোঁটা কৃপা করলেই রাস্তাঘাট অনায়াসে ডুবে অচল হয়ে যেতে পারে। কোন্‌খানে কখন যে তা হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। টালায় শুখনো দেখে বেরিয়ে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত আপনাকে যেতে হবে না। বিডন ষ্ট্রীট না পৌঁছোতে জুতো হাতে নিয়ে ধুতি কি প্যাণ্ট গুটোতে হবে। আগেকার দিন শুনেছি শুধু কালীতলা বর্ষার দিনে শহরবাসীকে জলচর হবার প্রেরণা দিত, এখন সমস্ত কলকাতাতেই কালীতলা ছড়ানো। আপনার নিজের অঞ্চলে বৃষ্টির বদলে শুধু মেঘের ডাক শুনলেও কোথাও না কোথাও জলাশয় পার হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরুতে হবে। তাই না হয় বেরুলেন, কিন্তু একসঙ্গে পায়ের ও মনের অসীম বল না থাকলে সে বেরুনোও বৃথা। ট্রামের

ত আজকাল মেঘ দেখলেই অযাত্রা, উইল না করে বাসে ওঠা সমীচীন নয়, আর সঙ্গতি থাকলেও ট্যাক্সির টিকি দেখতে পাবেন না। হ্যাঁ আছে বটে অধমতারণ বিপদভঞ্জন রিকশা কিন্তু সে ত সাগর ছেঁচতে ঝিনুক।

এই অবস্থার কথা আগেও একবার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করবার চেষ্টা করে আমাদের নগরপালকদের কবির মর্যাদা দিতে চেষ্টা করে এখন মনে হচ্ছে সম্মানটা পর্যাপ্ত নয় মোটেই। তাঁদের দূরদর্শী পরিকল্পনার মাহাত্ম্য তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। শুধু যে নগরের রূপবৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে তাঁরা জলনিকাশের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন তা নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্ভবত আরো গভীর।

হল্যাণ্ডের মত দেশ সত্যি সত্যি সমুদ্রকে হটিয়ে যদি জনপদের জমি কেড়ে নিতে পারে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইংলিশ চ্যানেল সুড়ঙ্গপথে পার হবার কথা পারে ভাবতে, তাহলে কলকাতার মত একটা শহরের সামান্য বর্ষার জলের কিনারা করা কি আমাদের পৌর-প্রধানদের অসাধ্য! তবু যে বছরের পর বছর তাঁরা সারা কলকাতা ক্রমশই বেশী করে ভাসাতে দিচ্ছেন তার কারণ কলকাতাকে সমস্ত প্রাচ্যে অনন্যা করে তোলার অভিপ্রায় বলে অনুমান করা যায় নাকি?

কলকাতার এই বর্ষার জল দেখতে দেখতে সারা বছরেও যখন থই থই করবে, সেই দিনের আশায় অসীম ধৈর্য ধরে তাঁরা অনেক কষ্টে হাত গুটিয়ে অপেক্ষা করছেন এমনও ত হতে পারে! কলকাতাকে প্রাচ্যের ভিনিস্ করে তাঁরা অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে চান হয়ত।

অন্তরের নিরুপায় ক্ষোভ ও দুঃখ একটু বোধহয় অসংযতভাবেই এতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করার পর মনে হচ্ছে বর্ষায় কলকাতার দুর্গতি যতই হোক তার একটা সুবিধের দিক অন্তত সত্যিই আছে। না, কাব্য করে তার বিচিত্র চিত্রসম্পদের কথা বলছি না, বলছি আমার

মত ঢিলে মানুষ যারা আছেন তাঁদের নিজেদের গাফিলতি ঢাকবার সুযোগের কথা। বর্ষার দোহাই দিয়ে কত ভুল-ত্রুটি অন্যমনস্কতার দোষই না ঢাকা যায়। সময়ের জ্ঞান যাঁর আমার মত একটু মাটো তিনি বর্ষায় এই তিনটি মাস অন্তত ঘড়ির কাঁটাকে অকুতোভয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারেন। বর্ষার কলকাতা তাঁর সব কথার খেলাপের জলজ কৈফিয়ত মজুত করে রেখেছে। যেখানে যার কাছেই হাজিরা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাক, ঘণ্টা দুই দেরি হলে কি বেমালুম ব্যাপারটা ভুলেও গেলে বর্ষার এই তিনটি মাস আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে কলকাতা শহরে অন্তত এমন কোন ভাবনা নেই, সারাদিনে এক পশলা কোথাও বর্ষাবার প্রমাণ যদি থাকে। নিজের বেলায় যেমন অন্যের বেলাতেও ত তেমনি। তাই আমার প্রকাশকের পেয়াদা বা পিয়ন আজ আর এসে না পৌঁছোতেও পারে এমন আশা করতেই বা বাধা কি?

শ্লেষ কি কৌতুক যাই হোক তা দিয়ে যতটুকু বিক্ষোভই প্রকাশ করে থাকি, আমাদের পৌর-বিবেকে কর্তব্যবোধ জাগানো তার উদ্দেশ্য পাছে কেউ মনে করেন এই আশঙ্কায় সবিনয়ে জানাতে হচ্ছে সে রকম কোন সাধু সংকল্প আমার নেই। সে বোধ জাগাবার মহৎ ব্রতে অনেক বেশী শক্তিমান লেখনী প্রতিদিন ক্যামেরা ও শিল্পীর তুলির সাহায্যে নানা দৈনিকে সাপ্তাহিকে নিয়োজিত। ফল তাতে কতখানি হয়েছে বা হবে জানি না, কিন্তু হলেও শুধু শুষ্ক কর্তব্যবুদ্ধির ওপর খুব বেশী ভরসা সত্যি কথা স্বীকার করতে গেলে আমার অন্তত নেই। পৌর-প্রধানদের ইতিপূর্বে কবি বলে দুর্বল রসিকতার চেষ্টা হয়ত করেছি, কিন্তু নিছক উপহাস তা নয়। এই বিব্রত বিশৃঙ্খল কদর্য নগরকে পরিচ্ছন্ন শ্রী ও সৌষ্ঠব দেবার জন্যে কবি ও শিল্পীর দৃষ্টিই সত্যি প্রয়োজন, আর তার চেয়ে বেশী কবি ও শিল্পীর উত্তুঙ্গ গর্ব। যথার্থ কবি কি শিল্পী তার সৃষ্টির পরাকাষ্ঠার জন্যে প্রাণপাত করে

শুধু কর্তব্যবোধের তাগিদে ত নয়, এমন এক দেবদুর্লভ অহঙ্কারে, উৎকর্ষের চরম শিখরের নিচে যার নজর নামে না। অনলস একাগ্র সে সাধনাকে কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ, কোন সাময়িক সুবিধার প্রলোভনই লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে অক্ষম। 'আমাদের কলকাতা' বলে রচয়িতার সেই অভ্রভেদী গর্ব যদি আমাদের স্ফীত করে তুলত তাহলে সব সমস্যার অনায়াসেই বুঝি মীমাংসা হয়ে যেত।

এই প্রেরণার জন্যে পৌর-প্রধানদের বাধ্যতামূলক কাব্যচর্চা প্রবর্তন করলে কেমন হয়?

এই কদিন আগেই সকালের খবরের কাগজটা হাতে তুলতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়েছে। সাধারণ কালো কালি দিয়ে ছাপা কাগজটা মনে হয়েছে যেন রক্তাক্ত। আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয়াবহ দৃশ্যটা ছাপার অক্ষর ঠেলে দিয়ে ফুটে উঠতে চাইছে মনে হয়েছে।

বাংলা দেশ অকালে অপ্রত্যাশিতভাবে অকারণে যাঁকে আকস্মিক দুর্ঘটনায় হারাল তাঁর কথা যথাস্থানে যথোচিতভাবে আলোচিত হচ্ছে ও হবে, এখানে এই আলোচনার বিষয় কিন্তু তিনি নন, অকালে, অকারণে তাঁকে যাতে হারালাম সেই আকস্মিক দুর্ঘটনা।

অকালে অকারণে শুধু তাঁকে ত আমরা হারাইনি, খবরের কাগজ খুললে এই হারাবার সংবাদ পাওয়া যায় না এমন দিনই নেই।

স্বনামধন্য বরেণ্য দেশের অত্যন্ত প্রিয়জন কাউকে হারালে সংবাদপত্রের আর্তনাদ তীব্র হয়ে ওঠে বলেই আমরা অতটা সচকিত হই নইলে কাগজের কোন না কোন স্তম্ভে নাতিস্ফুট এ বিলাপ নিত্যনৈমিত্তিক।

আঘাত, বেদনা, শোক বা আকস্মিক দুর্ঘটনা সংসারে ও জীবনে থাকবে-ই জানি। তা নিয়ে আক্ষেপের আতিশয্যের কোন অর্থ হয় না সত্যই।

কিন্তু যে সব দুর্ঘটনা আজ আমাদের বিচলিত বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, তা নেহাৎই আকস্মিক কিনা যদি সন্দেহ হয়? যাঁদের হারাচ্ছি তাঁরা অনেকেই অকারণে অকালে কারুর না কারুর অমানুষিক দায়িত্বহীনতার জন্যেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছেন এ ধারণা ধীরে ধীরে যদি মনের মধ্যে বদ্ধমূল হতে থাকে?

পরিসংখ্যানের বিচারে যন্ত্রসভ্যতার মূল্য হিসাবে কিছু-না-কিছু দুর্ঘটনা সকল দেশেই তার ঐহিক প্রগতির অনুপাতে ঘটতে বাধ্য।

যত দিক দিয়ে সম্ভব সাবধান হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রাস্তায় যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা একটা ন্যূনতম সংখ্যার গড়পড়তা হার বজায় রেখে যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে এই দুর্ঘটনাসমষ্টি ওঠা-নামাও করে। আমেরিকায় স্বাধীনতা দিবস এমনি একটি দিন। সমস্ত দেশ যখন আনন্দ উৎসবে মত্ত তখন মৃত্যু দেশের রাজপথে পথে তার নির্দিষ্ট রাজস্ব নির্মমভাবে আদায় করে ফেরে। কখনো দু-দশজন কম, কখনো বেশী।

আধুনিক যন্ত্রযুগের এই প্রাত্যহিক বলির হিসাব দেখতে গিয়ে এই হতাশ প্রশ্ন নিজেকে না করে পারি না যে মানুষ তার আদিম প্রাকৃতিক জীবনের অসহায় অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাবার দুরাশায় সভ্যতা সৃষ্টি করে বিশেষ কিছু লাভবান হয়েছে কি না!

সে প্রাকৃতিক আরণ্য জীবনে বিপদ ছিল পদে পদে। ছিল জলে-স্থলে শ্বাপদ ও সরীসৃপ, অর্থাৎ সাপ-বাঘ-কুমীর। ছিল মত্তহস্তী কি বন্য মহিষ বা অন্য হিংস্র ভয়াল প্রাণীর উৎপাত। মানুষকে অতর্কিতে প্রাণ দিতে হয়েছে অহরহ। জীবনের ওপর সব সময়ে অনিশ্চয়তার একটা করাল ছায়া থাকত প্রসারিত। সেই অনিশ্চিত ছায়ার ভ্রূকুটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই মানুষের অরণ্য থেকে জনপদ, জনপদ থেকে আধুনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ নাগরিক সভ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা। কিন্তু সে ছায়ার ভ্রূকুটি তাতেও সরেছে কি?

অরণ্যের শ্বাপদ-সরীসৃপদের অনেক দূরে ফেলে চলে এসেও মৃত্যুর অনিশ্চিত অতর্কিত আক্রমণ থেকে মানুষ নিশ্চিন্ত নিরাপদ হতে পারেনি। সাপ বাঘ কুমীরের জায়গা নিয়েছে মোটর, বাস লরী। অরণ্যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু কোন হিংস্র রূপ নিয়ে কোথা থেকে যে হানা দিতে পারে যেমন জানা থাকত না, আমাদের রাস্তাঘাটেও বর্তমানে তেমনি। কোন বাঁকে, আর বাঁকেই বা না কেন, আমাদের দেশে অন্তত, যে কোনো সরল মসৃণ প্রশস্ত রাস্তার স্পষ্ট দিবালোকে

কোন লরীর চালকের পথের অন্য সমস্ত যানবাহন প্রাণীকে কীটবৎ জ্ঞান করার উদ্ধত পাশবিক তাচ্ছিল্য যে মৃত্যুর বাহক হয়ে আসছে কেউ বলতে পারে না।

আদিম অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদ কি ক্রুর সরীসৃপের আক্রমণের তবু একটা কোন হেতু বা প্ররোচনা থাকত। আমাদের রাজপথের রথী এবং বিশেষ করে লরী-চালকের নিধন-বিলাস অহেতুক ও নিষ্কাম নির্বিকার বলতে ইচ্ছা করে।

অভিযোগটা যদি অন্যায় অযথা ও মাত্রাতীত মনে হয় তাহলে এই কলকাতা শহর ও তা থেকে নিষ্ক্রমণের যে কোন রাস্তায় প্রতিদিন তার চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রমাণ সন্ধান করা যেতে পারে।

পাল্কি ও ছ্যাকড়া গাড়ীর মাপে যে শহর তৈরী হয়েছিল আমূল সংস্কার না করে তাকে আধুনিক কালের যন্ত্রবেগের উপযোগী করা সহজ নয়। কলকাতা শহর এখানে ওখানে দু পাঁচটা রাস্তা ছড়িয়ে ও বাড়িয়েও তাই ট্রাম বাস মোটরলরীর সঙ্গে রিক্সা ঠেলা গাড়ির ক্রমবর্ধমান বাহুল্যে প্রায় রুদ্ধস্রোত অচল হবার উপক্রম। কলকাতার এই উদ্‌ভ্রান্ত অপরিসরতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বাইরে যাবার রাস্তাও বিরল। নাম করবার মত' ত শুধু জি টি, বি টি ও যশোর রোড। এই তিনটি রাস্তার যে কোন একটিতে যে কোনদিন একেবারে সাংঘাতিক না হোক পুলিসের ডায়েরীতে লেখবার মত দুর্ঘটনা যে বাদ থাকে না একটু চোখ মেলে রাখলেই পথের দুপাশে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মানুষের ক্ষমার্হ ভুলত্রুটি ও অপ্রত্যাশিত যান্ত্রিক গোলোযোগ ও বিকৃতিই শুধু যদি এসব দুর্ঘটনার কারণ হত তা হলে ভাগ্যের প্রতিকারহীন নির্মমতা বলেই সেগুলি মেনে নেবার চেষ্টা হয়ত করা

যেত। কিন্তু এসব রাস্তায় একবারও একটু দূরের পাড়ি যিনি দিয়েছেন তিনি জানেন যে, নিয়তি এখানে জগদ্দল দৈত্যাকার যন্ত্রযানে পদাতিক ও ক্ষীণদেহ অন্যান্য যানবাহনের প্রতি পর্বত-প্রমাণ অবজ্ঞা নিয়ে তুচ্ছ মানবজীবন সম্বন্ধে মূর্তিমান তাচ্ছিল্য হয়ে স্টীয়ারিং হুইলের পেছনে উপবিষ্ট থাকে। চরম কাপুরুষতার ঔদ্ধত্যে সে স্ফীত। অন্য সামান্য দুর্বল যানবাহন কি পদাতিকের পক্ষে তার দানবযানের একটু স্পর্শই যে সাংঘাতিক ও সর্বনাশা এই জ্ঞানটুকুর জোরেই দুরন্ত দুর্বার।

'শুনেছি যে-যন্ত্রশাসনে তাদের গতিবেগ বাঁধা থাকবার কথা আইনের চক্ষু রৌপ্য-চূর্ণে অন্ধ করবার ব্যবস্থা করে' তা এই সব লোকেরা নাকি বেশীর ভাগ বিকল করে রাখে।' দুর্ঘটনা ঘটালে তাদের বিচার হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সে বিচারে অপূরণীয় প্রাণের মূল্য কোন হিসাব ধরে নির্ণীত হয় জনসাধারণের তা স্পষ্ট করে জানবার দাবী করবার সময় কি আসেনি?

হিংসায়, লোভে, লালসায় কি ক্রোধের প্রচণ্ডতায় ও আক্রোশে কারুর প্রাণহরণ যদি হত্যা বলে বিচারযোগ্য হয়, তাহলে দুর্বিনীত দায়িত্বহীনতা ও জীবন সম্বন্ধে অমানুষিক ঔদাসিন্য যেখানে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার প্রধান হেতু সেখানে হত্যাকারী হিসেবেই অভিযুক্তের বিচার প্রার্থনা করা কি নিতান্ত উদ্ভট ও অযৌক্তিক?

পথে ঘাটে দুর্ঘটনা ঘটলে সাময়িক উত্তেজনায় জনসাধারণের নিজেদের হাতে শাস্তির ভার নেওয়ার মত একান্ত অন্যায় ও গর্হিত কিছু হতে পারে না। কিন্তু উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ জনতার ভ্রান্ত উন্মত্ত আস্ফালনের অন্তরালে যত বিকৃতভাবেই হোক, ন্যায়বিচারের যে তীব্র আকুলতা থাকে তার সুস্থ ও সংযত আত্মঘোষণা আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

অক্ষম অযোগ্যেরা রাজপথে যন্ত্রযান চালাবার অধিকার যেন

না পায় এ নির্দেশ ও ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্রে নিশ্চয় আছে। সেই ব্যবস্থার কোনো শৈথিল্যে বা অসাধু ছিদ্রপথে চালকের ছদ্মনামে পূর্বতন বা ভাবী কোন ঘাতক না প্রশ্রয় পায় এ বিষয়ে কঠোরতম সতর্কতা দাবী করবার সময় এসেছে।

রাজপথে যানবাহনঘটিত দুর্ঘটনার জন্যে যারা দায়ী তাদের বিচার প্রতিদিন কোনো না কোনো ধর্মাধিকরণে চলেছে। সে বিচারের নিরুত্তাপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিত্য দেখতে দেখতে আমাদের নাগরিক বিবেক বুঝি কিছুটা অবসন্ন ও উদাসীন।

অত্যন্ত সম্প্রতি যে নিদারুণ দুর্ঘটনা সমস্ত দেশকে স্তম্ভিত বিচলিত করে তুলেছে, বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ তারই বিচার-বিবরণকে দেদীপ্যমান প্রাধান্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপপ্রয়োগের ছিদ্রগুলি স্পষ্ট করে তোলা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখবার দায়িত্ব আমাদের কি নেই ?

সেদিন কোন এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে হাওড়া স্টেশনে যেতে হয়েছিল। হাওড়া স্টেশন—আর হাওড়া কেন ছোট-বড় যে কোন স্টেশনে ঢুকলে যাঁদের মনে কি রকম একটা অদ্ভুত বিস্ময় উত্তেজনাময় নেশার ঘোর লাগে আমি তাঁদেরই একজন। মেঘ পাহাড় সমুদ্র যেমন একরকম কাব্যময়তায় মনকে মাতায় রেলস্টেশনও আরেক রকমে তেমনি। আজকাল যা প্রায় বিরল হয়ে হয়ে আসছে সেই উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে পথ ভুলে যেন এসে পড়া ছোট স্টেশন মনে একটা উদাসকরা দূরত্বের সুর তোলে, টেলি-গ্রাফের তার আর জোড়া লাইনের সঙ্গতে ; আর হাওড়ার মত বিরাট স্টেশনে উর্দ্ধে ইস্পাত ও কাঁচের আধা-গম্বুজের সারি নিচে বিচিত্র ব্যস্ততাময় জনতাবর্তের সঙ্গে মিলে একটা অভিভূত করা বিস্ময়বিমুগ্ধতা যা বহুদিন আগে পড়া একটি বিদেশী কবিতা মনে করিয়ে দেয়। কবিতাটির যতদূর মনে পড়ছে আরম্ভ এইরকম ঃ—বৃত্তাকার এই যে বিশ্ব, মানুষ যার বিধাতা, তারও আছে সূর্যতারা, সবুজ সোণালী লাল, আর আছে ঘন ধোঁয়ার মেঘলোক, কুণ্ডলিত স্তরে স্তরে যা সুদূর লৌহাকাশ রাখে ঢেকে।

কবিতাটি রেলস্টেশন নিয়েই যে লেখা তা বলাই বাহুল্য। স্টেশনকে আশ্রয় করেই মানুষের অবহেলিত মহিমা সম্বন্ধে কবির উচ্ছ্বসিত আক্ষেপ তীব্র হয়ে উঠেছে তারপর ঃ হায় বিধাতা! নিজেদের মূল্য কবে আমরা দিতে শিখব! যুগান্তরের আগে দেখবো কি কোন এক মুহূর্তে বন্যা ও বহ্নির গর্জমান তুরঙ্গ-বাহনে ধাবমান মানুষের এই দৃপ্তরূপ!

এ কবিতা যখন লেখা হয় বন্যা ও বহ্নির গর্জমান তুরঙ্গ-বাহনের বেশী বেগবান কোন কিছু মানুষ তখনো উদ্ভাবন করতে পারে নি।

মোটরগাড়ির তখন শৈশব। রাজপথে তার আদিরূপ দেখা দিয়েছে কিন্তু যান্ত্রিক গতির চূড়ান্ত বলতে তখন বাষ্পীয় শকট অর্থাৎ রেলের স্টীম এঞ্জিনই বোঝায়।

তারপর অর্ধ শতাব্দীও পার না হতে গতিবেগের জগতে সত্যিই যুগান্তরের পর যুগান্তর ঘটে গেছে। পাখা ঘোরানো উড়োজাহাজ হটে গেছে জেট প্লেনের কাছে। বেগের পাল্লায় জেটকে হার মানিয়ে বাতিল করতে চলেছে রকেট, পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে। 'ধাবমান মানুষের দৃপ্তরূপ' রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে স্টীম এঞ্জিনে টানা ট্রেনের ছবি দিয়ে ভাবা এখন হাস্যকরই বলতে হয় সুতরাং।

কিন্তু গতিবেগের দিক দিয়ে যতই বাতিলের কোঠায় পড়ুক এখনো আমাদের মনে সুদূরের ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা জাগাবার প্রতীক হিসাবে ট্রেন আর স্টেশনের জায়গা অন্য কিছুতে নিতে পেরেছে কি?

রকেটের 'লঞ্চিং প্যাড' এখনো বহুকাল বোধ হয় আমাদের মত সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে থাকবে। প্লেনে যাতায়াতের জন্যে যে এরোড্রাম-এ আমরা অল্পবিস্তর অভ্যস্ত হয়ে এসেছি তা-ও প্রথম প্রথম কিছুটা বিস্ময়-বিমূঢ়তা ও অস্বস্তি জাগালেও স্টেশনের সেই বিস্ময়-চাঞ্চল্যের রণন আমাদের মনে বোধ হয় তোলে না।

কারণ খুঁজতে গেলে মনে হয় প্রয়োজনের দিক দিয়ে যত হালফিল ও মূল্যবানই হোক, সময়ের ছোপ না লাগলে কোন কিছুই আমাদের অন্তরের যথার্থ অনুমোদন পেয়ে ভাবাবেগের উপাদান হয়ে ওঠে না। ট্রেন কি স্টেশন খুব বেশীদিন মানুষের ইতিহাসে দেখা অবশ্য দেয় নি, তবু প্রায় সার্ধ এক শতাব্দী ধরে আমাদের জগতে জীবনের ছন্দে তা মিশে গেছে বলা যেতে পারে।

তাই অনেক বেশী দূরন্ত বেগের আশ্বাস সত্ত্বেও এরোড্রোমে গিয়ে যা পাই না, আমার মত অনেকে অন্তত ছোট-বড় যে কোন স্টেশনে

গেলে গতির দেবায়তনে প্রবেশ করার সেই একটা স্পন্দিত বিহ্বলতা অনুভব করেন।

কথাটা এইভাবেও বলা যায় যে, আমাদের বুদ্ধি যতই বিদ্রোহী কালাপাহাড় হোক, হৃদয় আমাদের অত্যন্ত গোঁড়া। সে সহজে তার আনুগত্য কি সংস্কার ছাড়ে না। মোহই বলি বা প্রেমই বলি, পুরাতনের প্রতি নিষ্ঠা তার সহজে ভাঙবার নয়। চিরকাল এবং বিশেষ করে এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষের বুদ্ধি তার হৃদয়কেও যে রকেট-দৌড় করাতে চাইছে, হৃদয়ের তাতে খুব সায় কি স্বাচ্ছন্দ্য নেই। এগিয়ে চলার বিষম টানে সে কেবল পিছন পানে ফিরে ফিরেই তাকায়।

ফিরে তাকাবার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দুর্বার, বেগই যেখানে আরাধ্য, সেই পাশ্চাত্ত্য জগতেই পাচ্ছি।

মোটর গাড়ি নিয়ে যে দেশ মত্ত, সেখানে সঙ্গতি যাঁদের আছে, তাঁরা ঘোড়ার আস্তাবল রেখে এখন নিজেদের বিশিষ্ট আভিজাত্য প্রমাণ করছেন। জেট বিমানে অতলান্তিক মহাসাগর এক বেলার পাড়ি হবার পর জাহাজের বিলম্বিত ভ্রমণই সম্ভ্রান্ত বিলাস হয়েছে। বিদ্যুতের ঝলমলানির বদলে সেই স্নিগ্ধ সাবেকী মোমবাতির আলোয় ভোজ দেওয়া সম্পন্ন সৌখিনতার চরম বলে গণ্য।

এসব হয়ত পয়সা যাদের কাছে খোলামকুচি তাদের আমিরী খেয়ালের নমুনা বলেই ধরা হবে। কিন্তু গতিপূজার আতিশয্যের উল্টো উৎপত্তি হয়ে যেখানে অচলতার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আর অন্য কিছুর জন্যে না হোক সুবিধার খাতিরেই সাবেকী ব্যবস্থা নতুন করে প্রবর্তনের ঝোঁক ও দেশে দেখা যাচ্ছে। যেমন বাজারের বা বিপণি সমাবেশের বেলায়।

আমাদের দেশের সেকালের ছোট-বড় নগরে যেমন, পৃথিবীর সর্বত্রই তেমনি কেনাবেচার বিনিময় কেন্দ্রগুলি নেহাৎ নীরস

প্রয়োজনের হিসাবে বাঁধা ছিল না কোন-দিনই। চক্‌বাজার বলতে যা বুঝি, নগরের সেই পণ্যতীর্থ, আগের যুগের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়েও তাদের অপরিসর বর্ত্মের সর্পিল সঞ্চরণে পদে পদে বিস্ময় ও উত্তেজনার চমক জুগিয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমের দেশগুলিতে মোটর গাড়ির দৌলতে সেই চক্‌বাজার ছড়াতে ছড়াতে শেষে সম্পূর্ণ কেন্দ্রচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে তার সার্থকতাই হারাতে বসেছে। নগর-স্থপতিরা তাই আবার সেই পদব্রজে বেচাকেনা করবার ঘন-সম্বদ্ধ চক্‌বাজার বসাবার পরামর্শই দিচ্ছেন। পৃথিবীর প্রাচীন সব নগর থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ রাস্তার সেই মধুর জটিলতা তাঁরা সৃষ্টি করতে চাইছেন যেখানে পথের অপরিসর অন্তরঙ্গতা মাঝে মাঝে আকস্মিক চত্বরের বিস্তারে যেমন বিস্ময় জাগাবে, পণ্যের সন্ধানে ঘোরা-ফেরাতেও তেমনি অভিযানের উত্তেজনা। কোপেনহেগেনের স্ট্রোজেল নাকি এমনি এক আধুনিক চক্‌বাজার। আর ভেনিস-এর Piazza San Marco থেকে Rialto পর্যন্ত হ্রস্ব গলি-পথটি নাকি পদে পদে চমকপ্রদ বৈচিত্র্যে এ ধরনের সরণী হিসেবে অদ্বিতীয়। দিল্লী আগ্রা, বারাণসী বা ভারতীয় প্রাচীন অন্য শহরের পুরাণো চৌক অঞ্চল বিদেশের এই সব পণ্যকেন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কি না জানি না, কিন্তু শোচনীয় অপরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও তা আমাদের মনে মোহাবিষ্ট বিস্ময় উত্তেজনার সাড়া কি এখনো তোলে না?

স্টেশন কি চক্‌বাজারকে উপলক্ষ করে যা বলতে চাইছি তা এই যে জীবনের ছন্দে মিশে ও সময়ের ছোপ লেগে যা কিছু আমাদের মুগ্ধ মমতা অর্জন করেছে, সময়েরই ছেদহীন স্রোতে বুদ্ধির মন্ত্রণায় পিছনের বিলুপ্তির অন্ধকারে তা আমরা ফেলে যেতে বাধ্য যখন ভাবি, তখন বুদ্ধির দম্ভের কাছে হৃদয়কে বার বার বলি দেওয়া অনিবার্য কি না, এ প্রশ্ন নিজেদের না করে পারি না।

নিত্যনূতনের মোহে শুধু এগিয়ে যাওয়ার নেশাতেই এগিয়ে চলায় নয়, শিল্প সাহিত্য থেকে শুরু করে জীবনের মূল্যবান সব কিছুতে মাধুর্য বিস্ময় মহিমার স্পর্শ যার মধ্যে পেয়েছি, সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে অটল নিষ্ঠায় তা চিরন্তন করে রাখাতেও মানুষের দুর্লভ গৌরব কি নেই ?

বিশ্বাস করা শক্ত হলেও সত্যই নিঃস্ব কি নিরক্ষর না হয়েও আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন কীর্তিমান বন্ধু খবরের কাগজ পড়েন না।

না পড়ার একটা কারণ অবশ্য এই যে, বৎসরের বেশীর ভাগ তাঁর এমন সব জায়গায় কাটে যেখানে খবরের কাগজের হাঁক পৌঁছোয় না।

নাম না করলেও অনেকেই হয়ত তাঁকে চিনবেন বলে তাঁর সামান্য একটু পরিচয়ই এখানে দিচ্ছি। বর্তমানে বাংলা দেশে তিনিই যতদূর জানি আদি ও অকৃত্রিম হিমালয়-পূজারী। হিমালয়ের অজানা দূর-দুর্গমে দীর্ঘকাল ধরে দুঃসাহসিক বিচরণ, তাঁর পেশা এমন কি নেশাও নয়, যেন এক আরাধনা।

হিমালয়ের সেই সৌন্দর্য, বিস্ময়, রহস্য, মহিমার ঊর্ধ্বলোকে সংবাদপত্র কেন, আমাদের পরিচিত নিত্যকার পৃথিবীর সব কোলাহলই নীরব শুধু নয়, নিরর্থক হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানকার সংবাদপত্র সমস্ত মহাকাশ জুড়ে বিস্তৃত। সেখানে মহাকালের অদৃশ্য সম্পাদনায় গিরির গৈরিক, বনের পীত-হরিৎ ও তুষারের শুভ্রতায় শাশ্বত বার্তা নিত্য মুদ্রিত হয়।

সে জগতে তুচ্ছ খবরের কাগজের কোন প্রয়োজন বোধ না করলেও আমাদের সমতল সংসারের স্থূল আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-উত্তেজনার রাজ্যে নেমে এসেও সংবাদপত্রের জন্যে কোন আকুলতা অনুভব না করা একটু বিস্ময়কর নিশ্চয়ই।

তাই পৃথিবীর প্রাত্যহিক ইতিহাসে কেন তাঁর রুচি নেই, একদিন কৌতূহলী হয়ে না জিজ্ঞেস করে পারি নি। তিনি সে প্রশ্নে একটু হেসে যা বলেছিলেন তার সঠিক অর্থ যতদূর বুঝেছি তা এই—মানুষের কীর্তি কলুষ থেকে ঘটনা দুর্ঘটনার সব খবরই এক হিসেবে নিতান্ত একঘেয়ে মামুলী এবং নিত্য এই সব পড়লে মন বড় নোংরা হয়।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুর চরমপন্থী মতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের অবশ্য' আদৌ সায় নেই। খবরের কাগজ ছাড়া এ যুগের দৈনন্দিন জীবন আমরা ভাবতেই পারি না।

তবু বর্তমান যুগে খবরের কাগজের মত প্রচার প্রমোদের বাহন-গুলির প্রতাপ প্রতিপত্তি ও জনচিত্তে তার আধিপত্যের পরিণাম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আমরা অনেকেই বোধহয় উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকি।

উদ্বেগ একেবারে অমূলকও নয় বলে মনে হয়। কারণ যন্ত্র-শাসিত এ যুগে জন-সাধারণের নিত্যব্যবহার্য বাহ্যিক উপকরণের মত তার মানসলোকের উপাদানও পাইকারী হিসাবে কলে তৈরী হয়ে আসাটা স্বাভাবিক ও শুভ বলে ভাবা শক্ত।

সাধারণ মানুষের মন আজকালকার সভ্যদেশে যে সেদিন পর্যন্ত শুধু খবরের কাগজ দিয়েই প্রায় সম্পূর্ণ মোড়া ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপ-আমেরিকার মত দেশে বহুকাল আগে থেকেই ভোর হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায়, সন্ধ্যার ছায়াও পড়েছে তাইতে। খবরের কাগজ অবশ্য এক নয়, একাধিক, দলাদলিও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট, কিন্তু পাঠকমনের চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্যও ভিন্নমতের কয়েকটি কাগজের সেই দলাদলির ঊর্ধ্বে সাধারণত ওঠে না।

শুধু রাজনৈতিক মতামতের বেলাতেই সংবাদপত্রের ও তার সাঙ্গপাঙ্গের এই প্রভাব যদি সক্রিয় হ'ত, তাহলে খুব বেশী দুর্ভাবনার হয়ত কিছু থাকত না! রাজনীতির কারবারই জনতা নিয়ে, বক্তৃতা-মঞ্চ বা সংবাদপত্র যেখান থেকেই হোক ঘোঁট পাকানোই তার কাজ। তাই সংবাদপত্র ও জনমন পরস্পরের মুকুর যদি হয় তাতে দুঃখ করবার এমন কিছু নেই।

দুঃখ তখনই যখন রাজনীতি ছাড়িয়ে জীবনের সব কিছুতে বর্তমান যুগের জনতোষিণী সদাগরী সদাব্রতের ছাপই প্রধান হয়ে

ওঠে, কলে ছাঁটা-কাটা সেলাই করা পোশাকের মত আমাদের অন্য রীতি-নীতি রুচি রসবোধের ক্ষেত্রে, সব ধারণা ভাবনা-চিন্তা এই সব উৎস থেকেই আমরা একেবারে কলে প্রস্তুত অবস্থায় কিনে ব্যবহার করি।

যন্ত্রযুগে আধুনিক ও সভ্য হবার এই সন্দেহজনক সুফলই আমরা কিন্তু ক্রমশ বেশী করে লাভ করছি। সাম্যের নামে এক নির্জীব কৃত্রিম সমতায় আমরা সবাই অল্পবিস্তর নিঃসাড়।

চোরদায়ে শুধু সংবাদপত্রকেই ধরা অবশ্য ভুল। সংবাদপত্রের ওপরে যায় তার জুটী সিনেমা ও রেডিও এবং ওদেশে তার চেয়েও সর্বনাশা পালের গোদা হয়েছে বর্তমানে টেলিভিসন।

সত্যি কথা বলতে গেলে সাধারণের চোখ-কান-মনের একচেটিয়া ইজারা এখন এই চতুরঙ্গের।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে, প্রধানত দেশের দারিদ্র্য ও অন্য কয়েকটি অসুবিধার জন্যে টেলিভিসনের কৃপা থেকে আমরা এখনো বঞ্চিত। হিল্লিদিল্লির মত দু-একটি বড়-মানুষী শহরে অদূরভবিষ্যতে চালু হলেও দেশে তার ব্যাপক প্রসার এখনও সম্ভব নয়।

টেলিভিসন যে সব দেশে ঘরে ঘরে, সে সব দেশের বড় বড় মাথা কিন্তু এখনই ঘামতে শুরু করেছে। সংবাদপত্রের আর যাই হোক ভালো-মন্দ দুদিকই আছে। ঘটনাই তার মূলধন, তাই রটনায় যত ভূয়ো রংই চড়াক, মূলে একবারে গোঁজামিল দেওয়া তার চলে না। সত্যের ছাঁচ তার গায়ে একটু লেগে থাকেই। সিনেমা কি ব্যবসায়ী বেতারের সে দায় নেই। চোখ-কানের ওপর আরো অন্তরঙ্গ দখল পাওয়ার দরুন টেলিভিসন ব্যবসার স্বার্থে অনিষ্ট করতে পারে এদের সকলের চেয়ে অনেক বেশী।

টেলিভিসনের দেশে সেই অনিষ্টের সুস্পষ্ট প্রমাণই সমাজ ও রাষ্ট্রের শিরোমণিদের শঙ্কিত করে তুলেছে। সস্তায় নয় সহজে

কিস্তিমাৎ করবার ফিকিরে টেলিভিসন ওদেশে খোরাক যোগাচ্ছে হীনতম রুচির, সুড়সুড়ি দিচ্ছে মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য রিপুগুলিকে। ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মস্তকগুলি চর্বিত হচ্ছে, অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসামাজিক মনোভাবই প্রশ্রয় পাচ্ছে তাদের মধ্যে। যন্ত্রসভ্যতায় যারা যত অগ্রসর তাদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিগত দুঃশাসন দুঃশীলাদের সমস্যা তত বেশী গুরুতর।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য রেডিওর মত টেলিভিশনকে বণিক-বুদ্ধির খর্পর থেকে যতদূর সাধ্য মুক্ত করার প্রস্তাব হচ্ছে। বিলেতেই সম্প্রতি প্রকাশিত 'পিলকিংটন রিপোর্ট'-এ ওদেশের বর্তমান টি ভি ব্যবস্থার যত দূর সম্ভব নিন্দা করে সেগুলিকে কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত করবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনও টি ভি-কে নির্মল করার দিকে নজর দিয়েছেন।

টেলিভিসন নিয়ে এই দুশ্চিন্তা ও বাক্য-ব্যয়, মাথা না থেকেও মাথা ব্যথার মত অনর্থক অবশ্য মনে হতে পারে। শুধু টেলিভিসনই আমাদের নেই এমন নয়, আমাদের বেতারও ব্যবসায়-ভিত্তিকের বদলে রাষ্ট্রকরায়ত্ত এবং আমাদের সিনেমাতে সেন্সর বোর্ডের পাহারা এড়িয়ে দুর্নীতি ও কুরুচি ভাঙিয়ে লাভ করার কিছু সুযোগ থাকলেও আমাদের দেশের সংবাদপত্রে ওদের দেশের মত নিম্নস্তরের সুলভ স্থূল উত্তেজনা যোগাবার চেষ্টা হয় না।

তবু সমস্যা আমাদের যে কম সঙ্গিন তা নয়। কারণ আসল সমস্যা অন্যত্র।

রেডিও সিনেমা কি টেলিভিসন বণিকবুদ্ধির আওতা থেকে বেরিয়ে এসে সভ্যভব্য ও যাকে বলে মার্জিত কিছুটা নিশ্চয়ই হতে পারে তবু তার মূল চরিত্র-দোষ কি শোধরাবার ?

মূল চরিত্র-দোষ বলতে তার কেন্দ্রীভূত কৃত্রিমতাই বোঝাতে

চাইছি। ব্যবসার হাট থেকে তাদের উদ্ধার করে পুরো কি আধা-রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন করলে সে দোষ দূর হওয়ার চেয়ে বাড়বারই সম্ভাবনা।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালিত রেডিও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা ও পরিবেশনের ব্যবস্থায় এ উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ বোধহয় পাওয়া যাবে।

আসলে এ যুগের এ সমস্ত ব্যবস্থার ধারাই বিপরীত ও অস্বাভাবিক বলতে ইচ্ছা হয়। সব মানুষকে সমান ভাববার খাঁটি কিংবা মেকি উৎসাহে তাদের অভিন্ন করবার মূঢ় আয়োজনই যেন চলেছে। সব মানুষ সমান হোক এই আমাদের আদর্শ, কিন্তু অভিন্ন হওয়া দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। কারণ বৈচিত্র্যেই মানুষের সত্যকার সার্থকতা। সে বৈচিত্র্য আপনা থেকে সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণা ও পরিবেশের পার্থক্যে। সেই বৈচিত্র্যের সম্মিলিত রূপেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেগ ও বৈভব।

বর্তমানের কেন্দ্রাতিগ জনতোষণের ব্যবস্থাগুলির প্রধান গলদ এইখানে যে তা স্বাধীন সত্তা ও সৃষ্টির এই উৎসগুলিকেই রুদ্ধ করে দিতে উন্মুখ।

পশ্চিমের উন্নত কয়েকটি দেশের যৎসামান্য যা পড়ে শুনে জানবার ও দেখবার সুযোগ হয়েছে তাতে এই কথাই মনে হয় যে, যন্ত্রাসুরকে পোষ মানিয়ে একালে যত কিছু সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের দানই তারা আদায় করে থাক না কেন, সাধারণ মানুষের সমস্ত জীবনের সঙ্গে মনটাও যেন সেখানে কলের গোলাম হতে চলেছে। এক বা একাধিক কেন্দ্র থেকে যা ভাববে তাই হবে সকলকে ভাবতে, হিংসা দ্বেষ রাগ উত্তেজনা হাসিকান্নাও যেন বাঁধা স্বরলিপির বাইরে যাবার উপায় নেই।

জামা কাপড় আসবাবপত্র থেকে আনন্দ শোক উৎসব ধারণা ভাবনা সব কিছুতেই কোন না কোন ট্রেডমার্কের ছাপ কোথাও মারা।

যন্ত্রযুগে অনেক কিছুতেই পিছিয়ে থাকার জন্যে আমাদের হয়ত সত্যিই লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু সেই পিছিয়ে থাকার দুর্ভাগ্যই কি সৌভাগ্য হয়ে উঠতে পারে না, দেরী করে পৌঁছবার দরুন জীবনের সব কিছুতে পাইকারী হিসাবে প্রস্তুত হবার নিয়তি যদি আমরা সময় থাকতে খণ্ডাতে পারি ?

সেই অবিশ্বাস্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার বিমূঢ় বেদনাময় আচ্ছন্নতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি না।

সমস্ত মনের ওপর একটা গাঢ় বিষাদের ছায়া আর তার সঙ্গে একটা বিহ্বল বিস্ময়ও।

ছোট বড় অসামান্য তুচ্ছ, উগ্র স্নিগ্ধ, প্রচণ্ড স্তিমিত, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই ত জীবনে আসে। তার মধ্যে এ অভিজ্ঞতা যেন সব কিছু থেকে আলাদা, প্রায় ধারণাতীত বলা যায়।

একটা বিরাট, বিশৃঙ্খল, নিত্য সংঘাত-ক্ষুব্ধ, অসংখ্য সমস্যা-পীড়িত, সংকীর্ণ স্বার্থে বহুধা বিভক্ত নগরকে এক মুহূর্তে চোখের ওপর এক অখণ্ড সত্তায় বিচলিত হয়ে উঠতে দেখলাম। সমস্ত শহরে আর যেন পৃথক ব্যক্তিত্ব কারুর নেই। বিশাল কাতর এক নগর-সত্তায় সব যেন একাকার হয়ে গেছে।

পয়লা জুলাই রবিবার। সূর্য তখন মধ্য গগনে, আকাশ প্রায় নির্মেঘ। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়নি কিন্তু বিদ্যুতের চেয়ে সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তি-তরঙ্গে প্রচারিত একটি সংবাদে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ তীব্র অতর্কিত যে আঘাত পেয়েছে তড়িতাহত হওয়ার মতই তার স্তম্ভিত নিস্পন্দ করা অনুভূতি।

তারপর যা ঘটেছে জনগণের মন নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরাও বোধহয় কল্পনা করতে পারেন নি কখনও। সর্বসাধারণের চিত্তে কখন কেন উত্তেজনা আবেগের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ওঠে নামে যাঁরা বহুকাল ধরে লক্ষ্য ও গবেষণা করে আসছেন তাঁদেরও সব হিসাব ভেস্তে গেছে।

কোথায় ছিল এ প্রচণ্ড আবেগের স্রোত, স্তব্ধ পুঞ্জীভূত হয়ে কোন গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের গোপন চিত্তলোকে?

এক মুহূর্তে তার স্বতঃউৎসারিত উত্তাল আন্দোলিত রূপ সারা দেশময় আমরা দেখলাম। নিজের মধ্যে যা ব্যক্তিগত বলে অনুভব করেছি, জানলাম দেশের প্রতিটি মানুষের মন সেই বিমূঢ় বেদনায় কাতর ও উদ্বেল।

যে মানুষটিকে নিয়ে জনাচত্তের এই বেদনা-বিহ্বল অস্থিরতা, দেশের নেতা হিসাবে তাঁর জীবনে বিস্ময়কর কোন বর্ণাঢ্যতা ছিল না বললেই হয়। সভা মাতিয়ে তোলা বক্তা তিনি কোনদিন ছিলেন না, আত্মপ্রচারের ঢাকে যাতে সহজে কাঠি পড়ে এমন নাটকীয় আস্ফালনের কাজে তাঁর রুচি ছিল না। আলঙ্কারিক ও বাস্তবিকভাবে আশপাশের প্রায় সকলের মাথা ছাড়িয়ে থাকলেও নিজেকে তিনি কি এক কৌশলে পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরিয়ে রাখতে জানতেন।

মহাধিকরণের মধ্যে নিজের জীবন-ব্রতে নিমগ্ন এই মিতবাক মানুষটি শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রতীক হিসাবেই সাধারণ মানুষের মনে স্থান পেলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। জনগণের মনস্তত্ত্বের বিচারে সেইটেই স্বাভাবিক বলে যাঁদের মনে হয়েছে তাঁদের অলীক ধারণা সেই নিদারুণ দ্বিপ্রহরে চূরমার হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। বিহ্বল বেদনার্ত বিস্ময়ে আবিষ্কার করা গেছে যে এই নিরলস নীরব কর্মযোগী সকলের অগোচরে সমস্ত দেশের হৃদয় কখন সম্পূর্ণভাবে জয় করে বসে ছিলেন কেউ জানতে পারে নি।

নিয়তির বিরুদ্ধে নালিশ নিষ্ফল, তবু বলতে ইচ্ছা হয় বিস্ময়কর আবিষ্কারটুকু এত বড় অপ্রত্যাশিত আঘাতের মধ্য দিয়ে না করালে কি চলত না!

আঘাত সত্যই অপ্রত্যাশিত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ-দেশের মানুষের গড়পড়তা পরমায়ুর সীমা অনেক আগেই পার হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর বেলা বৎসর-গণনা দিয়ে বয়সের বিচারটাই

ছিল যেন অর্থহীন। উৎসাহ উদ্যম শক্তি সামর্থ্য সব কিছুই তাঁর ছিল তরুণদেরও লজ্জা দেবার মত। জরা-বার্ধক্য-জয়ী অক্ষুণ্ণ যৌবনের প্রতিনিধি হিসেবেই তাঁকে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। তাঁর আকস্মিক তিরোধানে আমাদের শোক ও বেদনার সঙ্গে তাই অস্ফুট আরেক হতাশাও বুঝি মিশে গেছে। সে হতাশা জরা মরণের বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামে আর এক পরাজয়ের। তাঁর মৃত্যুতে আমাদেরই করুণ আশার দীপ আর একবার যেন নির্বাপিত।

বিধানচন্দ্রকে হারাবার বিমূঢ় বেদনা ও হতাশার মধ্যে একটি আবিষ্কার শুধু মনকে কিছুটা সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়েছে। সে আবিষ্কার এই যে, জনমন সম্বন্ধে বিচক্ষণদের সমস্ত মামুলী ধারণাই সম্ভবত ভ্রান্ত। মানুষের সমষ্টিগত মনকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেই আমরা এযুগে অভ্যস্ত। সে মন শুধু বাইরের চটকই বোঝে, আবরণ সরিয়ে গভীর কিছু বিচার করার তার ক্ষমতা নেই, প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞেরা এই বিশ্বাসই আমাদের মনে ধরিয়েছেন। কিন্তু বিধানচন্দ্রের তিরোধান এই ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বলা যায় না কি? নইলে নামের আগে ডাক্তার ছাড়া একটা রঙীন বিশেষণও যাঁর নেই, বেশ-ভূষা আচারে ব্যবহারে যিনি একান্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর ছিলেন, সারাজীবন রাজনীতির প্রকাশ্য মঞ্চে চমকপ্রদ কোন ভূমিকা যিনি কখনও নেন নি, সেই নীরব নেপথ্য-সাধকের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা প্রীতি অনুরাগ জনগণের মনে অলক্ষ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকত না। বিধানচন্দ্রের বেলায় অন্তত দেশের মানুষ খোসার বাহার অগ্রাহ্য করে শাঁসের মূল্য বোঝার ক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে দেশের স্বতঃউৎসারিত শোকের উত্তালতার মূলে এ আশঙ্কাও বোধহয় আছে যে, যে প্রতিভা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, কর্মশক্তি ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী

বিস্মিত অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করে' সমস্ত ভারতের পথ-প্রদর্শক হয়েছে সে-যুগের শেষ প্রতিনিধি বিধানচন্দ্রের সঙ্গেই তা বুঝি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

আঘাত যত তীব্র, অপূরণীয় ক্ষতির শোক যত উত্তালই হোক একদিন তাও শান্ত হয়ে আসবে জানি। বিষাদের গাঢ় ছায়া জীবনের প্রবাহকে রুদ্ধ করে রাখবে না। শুধু এই সাময়িক শোকাশ্রুতে আর্দ্র দেশের হৃদয়ে বিধানচন্দ্রের নিরলস নিষ্কাম কর্মযোগের দৃষ্টান্ত যদি অঙ্কুরিত হবার মত কিছু আদর্শের বীজ ছড়িয়ে যেতে পেরে থাকে তাহলে বিয়োগ-বেদনাও সার্থক বলে মনে করব।

কোন শিল্পনগর কোথায় বিধানচন্দ্রের নামে স্মরণীয় করে রাখা হবে, নগরের কোন রাজপথ তাঁর নামের স্মৃতি বহন করবে এ-সব সত্যিই এমন কিছু বড় কথা নয়। স্মৃতিরক্ষার এ-সব কৃত্রিম উপায় বর্জনীয় এমন কথা বলছি না, কিন্তু কালের ধূলি-মলিন আবরণে এ-সব প্রয়াস কখন যে ঢাকা পড়ে যায় আমরা জানতেও পারি না।

এই নগরের কত রাস্তার মোড়ে মোড়ে কত মর্মর মূর্তি আমাদের দৃষ্টি পর্যন্ত আজকাল আকর্ষণ করে না। কত রাস্তার নামের আদি মহিমা ও মর্যাদা বিস্মৃতির কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর কোথায় দাঁড়িয়ে নব-যুগকে বলিষ্ঠ সারল্য ও নির্ভীক আত্মনির্ভরতায় দীক্ষা দেবার জন্যে অপেক্ষা করছেন, কোথায় আছেন মধুসূদন, বঙ্কিম, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন মর্মর-স্মৃতি হয়ে তা আমাদের ভেবে নিতে হয়। কিন্তু এঁরা কেউই হারিয়ে যান নি দেশের মন থেকে। রাস্তার নাম-ফলকে কি খোদিত শিলায় নয়, তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন জাতির জীবনধারার প্রেরণা ও আদর্শ রূপে।

সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে বিজ্ঞানে একক কৃতিত্ব দেখাবার মত প্রতিভা এদেশে অচিরে একেবারে বিরল বোধহয় হবে না, কিন্তু বর্তমানে যে বিষয়ে আমাদের দৈন্য সব চেয়ে শোচনীয় সেই নিরলস ঐকান্তিক কর্মোদ্যমের প্রতীক ও প্রেরণা স্বরূপ বিধানচন্দ্রের কাছে ভাবীকালের সুপ্তিজড়তা ভাঙার মন্ত্র যদি নিতে পারি তা হলে তাই হবে তাঁর সবচেয়ে আন্তরিক স্মৃতি-তর্পণ।

খবরের কাগজের একটা দিকই একটু অন্যায়ভাবে বোধহয় কিছু পূর্বে দেখেছি! তার অন্য দিকটাও পাল্লা রাখতে এবারে দেখতে হচ্ছে। তার ছাপার কালি নেহাৎ শুধু কালিমাই লেপে দেয় না আমাদের পরকলার কাচে, যত ঝাপসা টেরা বাঁকাই হোক সংবাদপত্র বর্তমানের মুকুর হিসেবেও যে আমাদের নিজেদের স্বরূপ চেনায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে দেখে আর অস্বীকার করি কি করে!

খবরের কাগজ যখন ছিল না তখন যুগের পর যুগ সময়ের পদচিহ্ন আমাদের কত কষ্টেই না খুঁজে বার করতে হয়েছে! প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলছি না। শিলালিপি কি খোদিত তাম্রফলকের যুগের কথাও নয়, কাগজ উদ্ভাবন করে' মানুষ যখন থেকে লিখতে শিখেছে বলছি তখনকার দিনের কথা। সেই অতীতের কোন বিশেষ যুগের চেহারা চরিত্র বুঝতে হ'লে আমাদের প্রথমে খোঁজ করতে হয়েছে রোজনামচা বা আত্মজীবনী লেখার মত উৎসাহী কোন ব্যক্তির। সাধারণত এ ধরনের নিষ্কাম কণ্ডূয়নগ্রস্ত মানুষ বেশ বিরল। তাঁদের দেখা না পেলে মার্কামারা শখের কি ভাড়াটে ঐতিহাসিকের সন্ধান করতে হয়েছে। মার্কামারা ঐতিহাসিকও সব দেশে সব যুগে খুব বেশী মেলে না। যখন মেলে তখন তাঁদের ওপর খুব ভরসা সব সময়ে রাখা কঠিন। বেশীর ভাগ ইতিহাসই বিশেষ বিশেষ স্বার্থের বেদী থেকে নিজেদের সুবিধামত রঙীন কাচের ভেতর দিয়ে দেখা। এখনকার যুগে বৈজ্ঞানিক সমদৃষ্টি ও নিরপেক্ষ সততা বলতে যা বুঝি তা প্রাচীনকালে খুব কম ঐতিহাসিকের মধ্যেই দেখা গেছে। ইতিহাস লেখবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাঁরা বসেননি তাঁদের রোজনামচা কি আত্মজীবনীমূলক বিবরণে বরং যুগের চেহারা ধরা পড়েছে অনেক অবিকৃত সারল্যে।

এসব উপকরণ থেকেও কোন যুগের সামগ্রিক রূপ আমরা খুব স্পষ্ট করে পাই না। পণ্ডিত পুরাতত্ত্ববিদেরা শাস্ত্র সাহিত্য ইত্যাদির পুঁথিপত্রের ভেতর গোয়েন্দাগিরি করে এসবের অতিরিক্ত যা আবিষ্কার করেন তাই আমাদের সম্বল। একটা ভাসাভাসা যে ছবি আমরা পাই কল্পনা আর অনুমান দিয়ে তা ভরিয়ে তোলা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এই কল্পনা ও অনুমানের ব্যাপারেও বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের কাছে আমরা যে খুব সাহায্য পাই তা নয়। কারণ খোঁড়া কলম ও ঝাপসা কল্পনাই অধিকাংশ সময়ে নিজেদের অক্ষমতা লুকোতে ইতিহাসের আলো-আঁধারীতে আশ্রয় নেয়। সামনের বর্তমানকে দেখবার মত যাদের চোখের জোর নেই অতীতের আবছা যবনিকা তারাই রঙীন করে তোলার চেষ্টা করে তাদের দুর্বল কল্পনার সুলভ রঙে। তাদের রচনায় তাই অতীত বা বর্তমান কিছুই পাওয়া যায় না যথাযথভাবে। এসব উপন্যাসে সাধারণত ভাবালুতার চিনির পানা আর রাঙতায় সাজা বীরত্বের টিনের ঝঞ্ঝনার ছড়াছড়ি। অতীত মানেই সেখানে স্বর্ণযুগও বটে।

অতীত স্বর্ণযুগ বোঝবার একটা প্রবণতা আমাদের সকলেরই অবশ্য আছে। শহর ছেড়ে পল্লী বলতে যেমন, একাল ছেড়ে সেকাল বলতেও তেমনি অনেকেই আমরা গদগদ হয়ে উঠি। ধরা যাক দুশ বছর আগের বাংলা দেশেরই কথা। সে বাংলা ধনধান্য পুষ্পেভরা বলে কল্পনা করতেই আমরা ভালবাসি। ধর্মগত ও সামাজিক কুসংস্কারে মানুষের দৃষ্টি যে তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সামান্য শান্তি ও নিরাপত্তাও যে তখন খুব অল্প লোকেরই ছিল, প্রবলের অত্যাচার যে তখন প্রতিকারহীন এসব কথা আমরা অনায়াসে ভুলে যাই। ভুলে যাই যে স্থলপথে ও জলপথে তখন ডাকাত ঠ্যাঙ্গাড়ে ও ঠগীর রাজত্ব। সমস্ত দেশময় নামমাত্র শাসনের অন্তরালে শঙ্কিত অরাজক অনিশ্চয়তা। শুধু

বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর সর্বত্রই পিছন ফিরে তাকালে স্বর্ণযুগের ঝিলিক যে আমরা দেখি তা প্রায় ষোল আনাই কাল্পনিক।

অতীত থেকে বর্তমানের দিকে ফিরলেই কি তাহলে স্বর্ণযুগের আভাস মেলে? বর্তমানের দর্পণ কি বলে একবার দেখা যাক।

গত হপ্তায় সংবাদপত্রের নানা বিচিত্র খবরের মধ্যে কয়েকটি মাত্র পেশ করছি। যেমন, এক—যে বৈদেশিক বিনিময়-সম্পদ বাঁচাবার জন্যে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বিধিবিধানের ফাঁস লাগান হচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাফিলতিতে তার প্রায় অর্ধ কোটি মুদ্রা কখন কোথা দিয়ে যে গলে গেছে নেহাৎ ঘটনাচক্রে ধরা পড়ার আগে কেউ জানতেও পারেনি। দুই,—দিকে দিকে দারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশ যখন হা জল জো জল করছে ডি ভি সি-র জলের ঝারি যথারীতি তখন শুখনো। তিন,—এল আই সি তে জীবন-বীমার কিস্তি দিতে গিয়ে জনৈক বীমাকারীর কর্মচারীদের হাতে প্রহৃত হবার অভিযোগ। চার,—খোদ বিধানসভা-ভবনের রন্ধনশালা থেকেই কোন বিশিষ্ট সভ্যাকে পচা ডাল পরিবেশিত হয়েছে বলে সন্দেহ।

যেমন তেমন করে কুড়িয়ে নেওয়া এলোপাথাড়ি খবর।

চারটি সংবাদের কোনটির সঙ্গেই কোনটির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অবশ্য নেই। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচুর আশ্বাসের পরও ডি ভি সির জল না পেয়ে কোন ক্ষিপ্ত কৃষক এ দেশ জন্মের মত ছেড়ে যাবার পণ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ফাঁকি দেবার চক্রান্ত করেছে এবং বিধানসভা-ভবনেরই কোন কর্মচারী সেখানকার রন্ধনশালার কৃপায় যে কোন মুহূর্তে প্রাণ-সংশয় হতে পারে বুঝে জীবন-বীমার কিস্তি অচিরে জমা দেবার অতিরিক্ত আগ্রহে এল আই সি অফিসের শান্তি ভঙ্গ করার যথোচিত শাস্তি পেয়েছে, এরকম একটা বলিষ্ঠ উদ্দাম কল্পনার দ্বারা এ সব অসংলগ্ন সংবাদকে জোড়াবার চেষ্টা করলে

অবশ্য মন্দ হত না। সংবাদগুলি কিন্তু সত্যিই খেয়াল খুশীমত এলোমেলোভাবে সংগৃহীত। ইচ্ছে করলে চারটি সংবাদের জায়গায়, চল্লিশটি উল্লেখ করাও কঠিন ছিল না। কিন্তু চার বা চল্লিশ, সংখ্যায় যতই হোক, আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন এ সব সংবাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র কি সত্যিই নেই? এই সব বিচ্ছিন্ন বার্তাই সংবাদপত্রের মুকুরে দেশের ও যুগের বর্তমান রূপ কি প্রতিদিন ফুটিয়ে তুলছে না? বিধান-সভা-ভবনের ক্যান্টিনের পচা ডাল আর ডি ভি সির শুকনো খালের মধ্যে একই অক্ষমনীয় অযোগ্যতা ঔদাসীন্য কি কর্তব্যচ্যুতির উদাহরণ ভিন্ন আকারে যদি দেখি আর সেই দায়িত্বহীনতাই এল আই সিতে উদ্ধত তাচ্ছিল্যের রূপ নেয় ও শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনায় পাপের ছিদ্র খননের সহায় হয়ে ওঠে যদি মনে করি, তাহলে সেটা কি একান্তই আজগুবি কল্পনা!

আলস্যে ঔদাস্যে নীচতায় শঠতায় অন্ধ স্বার্থপরতায়, কর্তব্যবুদ্ধির নিদারুণ দৈন্যে ও অক্ষমতা ঢাকার সদম্ভ ঔদ্ধত্যে, রাষ্ট্র সমাজ ও জাতির যে চেহারা আজ প্রতিদিন যুগদর্পণে অস্পষ্ট বিকৃতভাবেও ফুটে উঠছে, তা একান্ত ঝাঁঝরা বলে ধারণা করা অহেতুক শঙ্কাবিলাস নয়। এই শতচ্ছিদ্র পরতে পরতে ঘুণ ও নোনা-ধরা আয়তন নিয়ে কাজ কোনরকমে চলে যাচ্ছে ঠিকই। ডালপালায় লতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে অল্পবিস্তর সবাই আমরা একই পাপচক্রান্তে চেতন ও অর্ধসচেতনভাবে জড়িত হয়ে প্রতিকারের হাত প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছি। কিন্তু এমন করে আর কতদিন!

জীবন্ত সুস্থ দেহেও কিছু পরিমাণ বিষ সর্বদা জন্মায়। সে বিষ কিছুদূর পর্যন্ত সয়ও। কিন্তু তারপর আর নয়। আমাদের মধ্যেকার বিষ কি মাত্রা ছাড়াতে চলছে না!

স্বর্ণযুগের স্বপ্নে দরকার নেই। শুধু একটু স্বাভাবিক সুস্থ যুগের

আশাও যে ক্ষীণ হয়ে আসছে বরদ বিজ্ঞানের সমস্ত দীক্ষা ও দান সত্ত্বেও !

পরাধীনতার কলঙ্ক মোচনের জন্য একদিন যারা প্রাণ দিয়ে যুঝেছে, স্বাধীনতাকে মৃত্যুময় গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্যে তাদের মধ্যে নতুন যুগের সংশপ্তকের কথা কেন এখন ভাবব না !

ইংরাজি, বাংলা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক হাতে পেলে আমরা সবচেয়ে আগ্রহভরে প্রথমে কি পড়ি? সাপ্তাহিক, মাসিকে অনেকেই প্রথম গল্প-উপন্যাস পড়েন নিশ্চয়। বিদেশী কাগজ হ'লে ছবিগুলোই প্রথম পাতা উল্টে দেখে যাওয়ার লোভ অনেকেই সামলাতে পারেন না। গল্প-উপন্যাসের পর সরস চুটকি আলোচনায় নজর যায়। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধকে সাধারণ পাঠক পাশ কাটিয়ে যান বেশীর ভাগ।

দৈনিক কাগজের বেলা নানা জনের নানা রুচি। কেউ আগে প্রথম পাতায় শিরোনামাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে একটি বেছে নেন বিস্তারিতভাবে পড়বার জন্যে। সব পাতাগুলো উল্টে ছোট-বড় সব শিরোনামাগুলোই আগে দেখে নেওয়া কারুর অভ্যাস। এমন অনেকেও আছেন যাঁরা কাগজ পেয়েই ভাঁজ করে ফেলেন আসল পাতাটি খুলে ধরবার জন্যে। সে আসল পাতাও সকলের এক নয়। কেউ কাগজ পেয়েই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েন খেলাধূলার পাতায়। খবরের কাগজের পাতাটাই গড়ের মাঠ হয়ে ওঠে চক্ষের নিমেষে। চাক্ষুষ দেখে আসা আগের দিনের খেলাটারই রোমন্থনের আনন্দ মেলে কাগজের বিবরণীতে। কাগজ পেয়ে আর সব কিছু ফেলে শেয়ার মার্কেটের পাতাতেই তন্ময় হয়ে যান এমনও অনেককে দেখেছি। ফাটকাবাজারের কানে তালা লাগানো হট্টগোলের শ্রুতি-সুখের জন্যে তাঁরা লালায়িত কি না জানি না, কিন্তু অন্যকিছু না হোক অন্তত ইণ্ডিয়ান আয়রনের তেজীমন্দির খবরটুকু না জেনে সকালের চায়ে যেন কেউ কেউ স্বাদ পান না। এ ছাড়া আইন আদালতের জগতেই প্রভাতে প্রথম নয়ন উন্মীলন করার জন্যে উৎসুক লোকের অভাব নেই।

এ সব ব্যক্তিগত রুচি জনে জনে পৃথক হলেও, তার কোনটি-ই এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। আমার একজন বন্ধুর খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহের কারণ কিন্তু বেশ একটু অদ্ভুত। শুধু খবরের কাগজ নয় মাসিক, সাপ্তাহিক যা-কিছু তিনি পড়েন সবই প্রধানত একটি বিশেষ আকর্ষণে।

সে আকর্ষণ হ'ল বিজ্ঞাপনের। তাঁর মতে সাময়িক পত্র-পত্রিকা মাত্রেরই সার বস্তু হ'ল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন পড়ে যা পাওয়া যায় বিশুদ্ধ খবর কি আলোচনা কি কাহিনীতে তা দুর্লভ। বিজ্ঞাপনের মধ্যেই উল্লাস, উত্তেজনা, বিস্ময় শুধু নয়, সমসাময়িকের যথার্থ অকপট স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত। পত্র-পত্রিকার সারাংশ বলে যা মনে করি, তা লেখে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন লেখক আর বিজ্ঞাপন লেখে ও ছাপে যেন স্বয়ং বর্তমানের কালপুরুষ।

শুধু ব্যবসায়িক ঘোষণায় নয়, কর্মখালি, বাড়ি ভাড়া থেকে হারানো প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ কি পাত্র-পাত্রী সংবাদেও সময়ের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন আমাদের সামনে মেলা। পাত্র-পাত্রী সংবাদের পাতাগুলো বছরের পর বছর উল্টে গেলে আমাদের সাম্প্রতিক সামাজিক বিবর্তন কোন্ দিকে চলেছে তা বেশ কিছুটা ধরা পড়বে। নেতারা যা-ই বলুন, সমাজ সংস্কারকেরা যা-ই নির্দেশ দিন কাহিনীকারেরা যে ছবি-ই আঁকুন, নরনারী সম্পর্ক থেকে শুরু করে বর্তমানকালের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত কিছুর নির্ভুল নিশানা ওই বিজ্ঞাপনেই দেওয়া আছে। দেশের মানুষ কি খায়, কি পরে, কোথায় থাকে, কি চায়, কি ভাবে, কখন কোন্ সমস্যায় পড়ে বা কোন হুজুগে মাতে, তা জানবার জন্যে খবর খুঁজতে কি গুরুগম্ভীর কোন প্রবন্ধ পড়তে হবে না, বিজ্ঞাপনে যা ছাপানো ও যা লুকানো, তা ঠিক মত পড়তে জানলে এ সব কিছুই জলের মত পরিষ্কার হওয়া উচিত।

বিজ্ঞাপন ব্যাপারটা আমাদের মত সাধারণ মানুষ চিরকালই তবু একটু সন্দেহের চোখে দেখে। বিজ্ঞাপন—বিশেষ করে কেনা-বেচার বস্তু সম্বন্ধে সাউখুরি করা যার কাজ, তাতে একটু রং-চড়ানো অতিশয়োক্তি অবশ্য থাকে। নির্জলা সত্যি তার মধ্যে আশা করাই ভুল। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মেশানো মিথ্যার ভেজালটুকুও আমার বন্ধুর মতে অবহেলা করবার নয়। বিজ্ঞাপনের ভুয়ো বড়াই থেকেই ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনেরই মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তত বোঝা যায়। সত্যের ওপর স্বপ্নের পালিশ হিসেবেই ওই মিথ্যেটুকু দামী।

বিজ্ঞাপন নিয়ে এতটা বাড়াবাড়িতে মনের সায় না থাকলেও বিজ্ঞাপন ছাড়া পত্র-পত্রিকার কথা আমরা এখনো ভাবতে পারি কি? পড়ি বা না পড়ি পাঠ্য বিষয়ের আশেপাশে মেলার দোকান-পাটের মত বিজ্ঞাপন না থাকলে যেন সবই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কলকাতার সারা শহরটাতেই রেড রোডের মত সভ্য-শৌখীন রাস্তা বিছানো থাকলে যেমন হত।

প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন যে আমাদের মনের ওপর কি রকম দাগ রেখে দেয় বহুদিন আগে লেখা একটি গল্পে কিপলিং তার চমৎকার প্রমাণ দিয়েছিলেন মনে পড়ছে।

কিপলিং-এর সে গল্প যখন লেখা হয় তখনও আকাশে ওড়া মানুষের কাছে প্রায় আকাশকুসুম। বেলুনে ছাড়া শূন্যে বিচরণের আর কোন উপায়ই তখনও সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয় নি। সেই যুগে কিপলিং আকাশযানের একটি কাল্পনিক ও তখনকার দিনের পক্ষে আজগুবি গল্প লিখেছিলেন। সমস্ত পৃথিবীময় যেন খেচর বিমান চলাচল শুরু হয়ে গেছে, আর শূন্যচারী হওয়ার কৌশল আয়ত্ত করেই বিমানচালকগোষ্ঠী যেন বিশ্বের শাসনভার নিতে চলেছে এই হ'ল গল্পের বিষয়।

গল্প এমন কিছু আজব অপরূপ নয়। বৈজ্ঞানিক কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়ে আরও অনেকেই তখন আকাশ-বিহারের কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু রাডিয়ার্ড কিপলিং সে সব লেখকের ওপর টেক্কা দিয়েছিলেন শুধু একটি মজার কায়দায় ও কেরামতিতে। কাহিনীটি যেন কোনো ভাবীকালের ছাপানো পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে আনা এইভাবে সেটিকে তিনি বিজ্ঞাপনে ঘিরে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনগুলিও সবই বানানো। কিন্তু আসল মুন্শীয়ানা ছিল সেই বিজ্ঞাপনের বিষয় ও ভাষা উদ্ভাবনে। আজগুবি কল্পনাকে সেই বিচিত্র বিজ্ঞাপনের বেষ্টন-ই বাস্তবতার আদল দিয়েছিল।

মানুষ আরও সভ্য, উন্নত হবে আশা করতে দোষ নেই। আমাদের বর্তমান নোংরা বিশৃঙ্খল নগরজীবনের অনেক গ্লানি তখন ঘুচে যাবে হয়ত। কিন্তু সে যুগের সেই পরিচ্ছন্ন সব স্থাপত্য-মহিমাময় নগরের প্রশস্ত রাজপথগুলিতে আদর্শ পণ্য-কেন্দ্রের কল্যাণে, রঙের বা আলোর অক্ষরে বিচিত্র শোভায় বিজ্ঞাপিত ছোট-বড় দোকানপাটের মেলা কি আর দেখা যাবে না! আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলি অভিজাত ও বিশুদ্ধ হ'য়ে বিজ্ঞাপনের ইতর সংশ্রব কি পরিহার করবে?

ভবিষ্যৎ এমনি উজ্জ্বল যদি হয়, তবু আগামীকালের সুখী ও সৌভাগ্যবান নাগরিক ও পাঠককে তেমন ঈর্ষা করতে বোধ হয় পারব না।

একান্ত শিল্পসম্মত হ'লেও বিজ্ঞাপনের মধ্যে আত্মপ্রচারের অমার্জিত স্থূলতার একটু স্পর্শ যে থাকে তা অস্বীকার করবার নয়। তবু যত দোষই থাক, বিজ্ঞাপন কেমন করে যেন স্বাধীন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক জগতেরই আশ্বাস দেয়। বিজ্ঞাপনের সে হরেক সুরের গোল থামিয়ে দিলে তার জায়গায় বিজ্ঞপ্তির জবরদস্ত কণ্ঠই পাছে একেশ্বর হ'য়ে ওঠে, এই ভয়।

এ দুটি তৎসম শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ে প্রায় যমজ হলেও, আমাদের কাছে ব্যবহারগত অর্থে তাদের পার্থক্য, মুক্তমনের স্বাধীন উদ্‌যোগ আর পালিতজনের শান্ত বাধ্যতার মত দুস্তর।

যেখানে বিজ্ঞাপন সেখানে ব্যক্তি এখনও স্বীকৃত বলে বুঝতে হবে, আর যেখানে শুধু বিজ্ঞপ্তি, সেখানে যত সুশৃঙ্খল ও গতিশীলই হোক অবিশেষ আত্মসত্তাহীন একটা সমষ্টিগত জড়তামাত্রই বিরাজমান।

একবার ধরলে ছাড়া বুঝি শক্ত। খবরের কাগজের পাতা থেকে এখনও মুখ না তুলে তাই জানাচ্ছি, কিছুদিন আগে কোনো অগ্রগণ্য দৈনিকের একটি চিঠি অপ্রত্যাশিত দিক থেকে মনকে নাড়া দিয়েছিল।

খবরের কাগজের এই একটি বিভাগ সাধারণ পাঠক কি চক্ষে দেখেন তার কোনো শুমারি হয়েছে কি না জানি না, আমার নিজের কাছে কিন্তু এটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। শহরের বাড়ি ঘর রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে এ যেন রেলিং দেওয়া হলেও খানিকটা খোলা মেলা জমি, আকার তার যেমনই হোক। বাড়িঘরে মালিকানার প্রশ্ন আছে, রাস্তাঘাটের আছে জন-প্রবাহেরই নিজস্ব প্রয়োজনের বিধিনিষেধ। পার্ক বা যাই বলি এই মুক্ত প্রান্তরের প্রতিনিধি স্বরূপ জায়গাটিতে কিছু চলাফেরা বসার স্বাধীনতা অন্তত আছে। শুনেছি লণ্ডনের হাইড পার্কে একটা টুল কোনরকমে যোগাড় করলেই গলা ছেড়ে দুটো মনের কথা দু'পাঁচজনকে শোনানো যায়। চিঠিপত্রের বিভাগও নেহাৎ বেয়াড়া বাতুল না হলে সকলের জন্যে খোলা। সাধারণ পাঠকের কত বিচিত্র কণ্ঠই না সেখানে শোনা যায়! মতামতের কি রংবেরং-এর মেলা। খবর, বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয় সব সেরে 'সম্পাদক সমীপেষু' বা 'পাঠকপাঠিকার প্রশ্ন' বিভাগে, তাই অচেনা মুখ খুঁজতে আর অজানা কথা শুনতে প্রায়ই আমি টহল দিয়ে থাকি।

এই টহলদারিতে বিচলিত বিস্মিত করার মত অনেক কিছুই মেলে। পাঠকদের দিয়ে কাগজের কিছুটা পাতা ভরিয়ে নেওয়ার এ ব্যবস্থা এক হিসেবে চতুর সম্পাদনা কৌশল মাত্র বলে সন্দেহ যে করে করুক, আমাদের এতে লাভ বই লোকসান নেই।

সেদিন একটি চিঠিতে সত্যিই বড় চমৎকার একটি প্রস্তাব পেয়েছিলাম।

চিঠি লিখেছেন শান্তিনিকেতনের কোন ভদ্রলোক। শান্তি-নিকেতনে যেতে হলে 'বোলপুর' স্টেশনে নামতে হয়। শান্তি-নিকেতনবাসীর সুবিধার কথা ভেবেই নিশ্চয় বোলপুর ছাড়িয়ে শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি আরেকটি স্টেশন বসাবার আয়োজন চলছে। এ স্টেশনের নাম নাকি ঠিক হয়েছে 'প্রান্তিক'।

'প্রান্তিক' শব্দটি শ্রুতিকটু ত নয়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম হিসাবে বরং আরো মধুর মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং 'প্রান্তিক' নামটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপত্তি করবার কিছু নেই।

কিন্তু পত্রলেখক যে দিক থেকে এই নামটির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন তা অবহেলা করবার নয় বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে।

পত্রলেখকের প্রান্তিক নামটি সম্বন্ধে আপত্তি শব্দের দিক দিয়ে নয়, সুরের দিক দিয়ে বলা যায়।

এই সুরের সঙ্গতির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি যা বলেছেন আজকের দিনে আমরা প্রায় তা ভুলতেই বসেছি। তাঁর চিঠিটি সেই জন্যেই বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমা ছাড়িয়ে আমার কাছে একটি বড় ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। 'প্রান্তিক'-এর পরিবর্তে যে নামটি তিনি পেশ করেছেন তা বোলপুর আর কোপাই স্টেশনের মাঝখানে একটি স্টেশনের গায়ে কোনদিন লেখা হবে কি না জানি না, কিন্তু তাঁর নাম পরিবর্তন করতে চাওয়ার যুক্তি আমাদের এ যুগের উদাসীন মনকে একটু বিচলিত করলে বোধ হয় ভালো হ'ত।

পত্রলেখক 'প্রান্তিক' নামটির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়ে

বলেছেন লুপ লাইনের ওই অঞ্চলটির স্টেশনের নামগুলির একটি বিশেষ নিজস্ব সুর আছে। সে সুর যেন সেখানকার আঞ্চলিক চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। গুস্করা ভেদিয়া বোলপুর কোপাই যে সুরে বাঁধা তার মধ্যে যত মনোরমই হোক 'প্রান্তিক' যেন ছন্দোপতনের মত। পত্রলেখক তাই ওই অঞ্চলের সঙ্গে সুরে মিলিয়ে ভাবী স্টেশনটির নাম 'খোয়াই' রাখার প্রস্তাব করছেন। কবিগুরু জীবিত থাকলে এ নামে তাঁর আপত্তি হ'ত না বলে পত্রলেখকের ধারণা।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসও তাই। কিন্তু তুচ্ছ নামে কি আসে যায়? স্টেশনে যদি গাড়ি ঠিকমত থামে আর নামাওঠার সুবিধে থাকে তাহলে যে কোন নামই থাকুক, তা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কিসের—কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন।

নাম নিয়ে নিরর্থক বাড়াবাড়িতে কিছুটা লজ্জিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রায় সায় দিয়ে ফেলবার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে অনুভব করেই একটু চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠছি। যুগধর্মের প্রভাব নিশ্চয়। আমরা সুবিধে বুঝি, সুর নয়। আর সুর ত সত্যিই ধোঁয়াটে মনগড়া ব্যাপার। তাও আবার সেই সুর যা মিলিয়ে স্টেশনের নামকরণ করতে হয়! আমাদের দরকার মত স্টেশনই জোটে না, জুটলে সেখানে সময়মত ট্রেন আসে না, এলে তাতে নেহাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী না হলে জায়গা পাওয়া যায় না, জায়গা পেলেও কখন কোন কর্তব্য নিষ্ঠার আদর্শ কর্মীর অনুগ্রহে বা পচা স্লিপারের ওপর ক্ষয়ে যাওয়া রেলের সঙ্গে জরাগ্রস্ত ইঞ্জিনের চাকার শিথিল প্রেমালিঙ্গনে একেবারে ভবনদী পার হতে হবে সেই ভাবনায় ঘুম হয় না, তা আবার সুর মিলিয়ে নাম!

গুস্করা ভেদিয়া কোপাই-এর সঙ্গে খোয়াই মেলাবার চেয়ে মাথা ঘামাবার যোগ্য অনেক গুরুতর সমস্যা আমাদের আছে নিশ্চয়।

সে সব সমস্যার সুরাহা যদি করতে পারি সুর তখন আপনিই মিলবে, কিংবা মেলাবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাবে।

যুগ ধর্মের দীক্ষায় ওই কথাই মেনে নিতে গিয়ে কোথায় তবু একটা খটকা লাগে।

সত্যিই কি আগে সমস্যার সমাধান তারপরে সুর ?

সুবিধার খাতিরে জীবনের সুর কাটা পড়েছে বলেই অনেক সমস্যা এত সঙ্গীন এমনও কি হতে পারে না ?

স্টেশনের নাম অতি তুচ্ছ ব্যাপার! কিন্তু ওই তুচ্ছ ব্যাপারেও সুরের কান সজাগ রাখতে শিখলে এ যুগের বহু বেসুরো বিকৃতির বিরুদ্ধে যোঝবার বল ভেতর থেকেই জন্মায় বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও যে করে।

সেই সঙ্গে এই স্বপ্ন দেখতেও সাধ হয় যে, যত বড় সুখ, সুবিধা বা শক্তিই হোক সুন্দরের ছন্দে, জীবনের সৌষ্ঠবময় পূর্ণতার সুরে যা মেলে না, তার প্রলোভনে অটল থাকবার অবিশ্বাস্য শপথ নিয়েছে আমাদের এই ঊর্ধ্বশ্বাস উদভ্রান্ত যুগের সভ্যতা !

স্বপ্নের কথায় মনে পড়ল, নিষ্ফলা আমগাছ আর নামহীন বন্যলতা যিনি লালন করেন আমার সেই বন্ধুটিকে সেদিন একটু রূঢ়ভাবেই ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হয়েছি। সেদিন সকালে আগের রাত্রের অদ্ভুত এক স্বপ্নের কথা তিনি শোনাচ্ছিলেন। কোন এক নগরে—সেটা কলকাতা কি না স্বপ্নে ঠিক স্পষ্ট হয়নি—ধর্মাধিকরণ মহাকরণ থেকে নানা প্রতিষ্ঠানের বিরাট সমস্ত কর্মকেন্দ্রে তাঁকে যেন ঘুরে বেড়াতে হয়েছে কার অলঙ্ঘনীয় নির্দেশে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত তিনি যত না হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছেন আতঙ্কবিহ্বল। নগর-প্রধানদের বিশাল সব আয়তন কক্ষের পর কক্ষ। কিন্তু সবই প্রায় শূন্য। অনেক কষ্টে যে কয়েকজনের দেখা পেয়েছেন

তাঁদের এ রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। যেখানে গেছেন সেখানেই মৌন একটা নিদারুণ ত্রাসের ছায়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। এ কোন অভিশপ্ত নগরে এলাম, ভেবে ঘুমের মধ্যেই তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছেন। ঘুমও ভেঙেছে সেই সঙ্গে।

স্বপ্ন কথা শেষ করে বন্ধু উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন,—এ স্বপ্নের মানে বলতে পারো? কেনই বা এমন স্বপ্ন দেখলাম?

স্বপ্নের মানে আর তা দেখবার কারণ এই! —তাঁরই টেবিলে রাখা আগের দিনের কাজের একটি খবর দেখিয়ে বলেছি, কোন অর্বাচীন দেশে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে কার প্রাণদণ্ডের কি খবর পড়েছ, আর ঘুমের মধ্যে অসুস্থ মস্তিষ্কে এই সব অলীক আতঙ্কের ছবি চাড়া দিয়ে উঠেছে। আরে মূঢ়, এ আমাদের উদার সভ্য দেশ। এখানে খাদ্য কি ওষুধে ভেজাল দিয়ে মড়ক বাধালে যৎকিঞ্চিৎ জরিমানা বা কারাদণ্ডের বেশী শাস্তি নেই। তোমার সুতরাং মনঃসমীক্ষণ দরকার।

আকাশের রঙ আলাদা, আলাদা অন্নজলের স্বাদ, বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার তৃপ্তিই অন্যরকম।

তাই অন্তত তারা ভেবেছে,—সেই তারা, যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পৌঁছে গেছে যৌবনে।

ফোর্ট উইলিয়ামে যখন গোরা সেপাই, রাজভবন আজ যার নাম, সেখানে যখন ছোটলাট, হাইকোর্ট সেক্রেটেরিয়টের মাথায় যখন ইউনিয়ন জ্যাক, দেশের সর্বত্র সমস্ত ব্যাপারের মাথায় ইংরেজ, তখন যেভাবে জীবনধারা চলেছে তা আমূল যাবে বদলে এই ছিল অন্তত সেকালের স্বপ্ন ও সাধনা।

তারপর কেমন যেন ভোজবাজিতে সেই অসম্ভবই সম্ভব হল। যেখানে যা পাত্তাড়ি সব গুটিয়ে ইংরেজ সাগর পারে ফিরে গেল আমাদের ওপরই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে। সাধের দেওয়া নয় নিশ্চয় সুখেরও নয়, হালে পানি আর মিলবে না জেনেই হয়ত দেওয়া কিংবা ইতিহাসের স্রোতকে ঠেকানো যাবে না জেনে গভীর দূরদর্শিতায় নিরুপায় বর্জনকে ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত করে নিয়ে বিদায় নেওয়া।

প্রভুত্ব ছেড়ে যারা গেল তারা কিন্তু জ্ঞাতসারে ও অজান্তে বিষবৃক্ষের বীজ গেল ছড়িয়ে। এমন নালা কেটে গেল দেশের বুক চিরে যা সাগরপারে জাহাজগুলো নোঙ্গর তুলতে না তুলতেই রক্তে গেল ভেসে।

সে রক্তস্রোত যদি বা থামল, ছড়িয়ে যাওয়া বীজ দিকে দিকে অঙ্কুরিত হল বিষবৃক্ষের চারায়। আকাশ বাতাস সবই বুঝি বিষাক্ত হয়ে যায়!

এসব কথা আমরা সবাই জানি। ইউনিয়ন জ্যাককে সরিয়ে তিন রঙা অশোকচক্রলাঞ্ছিত পতাকা নগরশিখরে শোভা পাবার পর

থেকেই চোখের ওপর অনেক কিছু ঘটতে দেখেছি ও দেখছি। আকাশের রঙ, অন্ন-জলের স্বাদ বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার তৃপ্তি অন্য-রকম বলে এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। বেশ কিছুটা স্বপ্ন-ভঙ্গ যে হয়েছে তা স্বীকার না করে আর উপায় নেই।

হয়ত বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন অবাস্তব মাত্রছাড়া হয়েছিল বলেই হতাশাটা এত তীব্র হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে যে তফাৎ, প্রত্যাশা ও পরিপূরণের মধ্যে যে গরমিল দেখছি তার সাফাই গাইবার চেষ্টার আমাদের ত্রুটি নেই! সেই সাফাই-এর মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজবার প্রয়াসটুকু লজ্জাকরও বটে।

সাফাই গাইতে একটা যুক্তি আমরা প্রায় দিয়ে থাকি এই যে, আহবের বদলে আপোসে পেয়েছি বলেই আমাদের স্বাধীনতার এই রুগ্ন পাণ্ডুর চেহারা, বীরের রক্তে মুক্তির কৃপাণ রঞ্জিত হয়নি বলেই কাপুরুষ ঘাতকের ছুরিকায় সেই রক্তই স্বাধীনতার বেদী পবিত্র করার বদলে পঙ্কিল করে তুলেছে।

আমাদের আর এক সাফাই সমস্ত অপরাধ ভূতপূর্ব বিদেশী শাসকের ওপর চাপিয়ে দায় এড়ানো।

বিরোধের বিষ তারাই এমন করে আমাদের রক্তে মিশিয়ে দিয়ে গেছে যে, সহজে আর শোধন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রদেশে প্রদেশে জাতিতে জাতিতে ভাষায় ভাষায় ভেদাভেদের এমন কাঁটা-গাছের বেড়ার পত্তন তারা করে গেছে, যা মুক্তজীবনের প্রথম বিশৃঙ্খলার সুযোগে নির্বিবাদে বেড়ে উঠে আমাদের উদার অখণ্ডতার দৃষ্টিই দিচ্ছে আড়াল করে।

এ-সব সাফাই-এর মধ্যে কিছু সত্য নেই, এমন নয়, কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ মধুরের বদলে এখনো যে মাঝে মাঝে তিক্ত বলেই সন্দেহ হয় তার কারণ শুধু ওই নয়।

কোনো বিশেষ একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আমরা পাইনি ঠিকই,কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে রক্তাক্ত সংগ্রামের তুল্যমূল্যই অসংখ্য আত্ম-বলিদানে কি আমরা দিই নি ?

আর বিদেশী শাসক তার নিজের স্বার্থেও দখল ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়ার আক্রোশে ভেদ-বিভেদের যত বিষাক্ত বীজই ছড়িয়ে গিয়ে যাক আমাদের নিজেদের প্রকাশ্য ও গোপন প্রশ্রয় না থাকলে তা মূলেই বিনষ্ট কি হত না !

না, স্বাধীনতা অর্জনের দাম আমরা ঠিকই দিয়েছি তবে স্বাধীনতা শুধু অর্জন করলেই যে হয় না, তার মর্যাদা রাখবার যোগ্যও যে নিজেদের করে তুলতে হয় সেই কথাটাই ভুলে গেছি, ভুলে গেছি যে, এ বস্তুর দাম একসঙ্গে থোক কিছু দিয়েই চুকিয়ে ফেলা যায় না, চিরদিন সজাগ থেকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে তার মূল্য দিয়ে যেতে হয়।

সে মূল্য যে আমরা দিইনি ও দিচ্ছি না তার প্রমাণ খুঁজতে গোয়েন্দা লাগাতে হবে না। চারিদিকে প্রতিদিন সে প্রমাণ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতা যারা এনেছে আর আজ তা যারা ভোগ করছে, উভয়ের মধ্যে প্রেরণার ধারাই যেন গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এক অংশের চরম আত্মোৎসর্গের মূল্যে আরেক অংশ নিখরচায় যা পেয়েছে তার তাৎপর্যই তাদের কাছে তুচ্ছ।

স্বাধীনতা মানে তাদের অনেকের কাছে শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যথেচ্ছাচারের সুযোগ ছাড়া কিছু নয়।

পরাধীনতা থেকে মুক্ত হবার পরই এই ধরণের উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের বহু দৃষ্টান্তই অনেকে স্মরণ করতে পারবেন। ট্রেনের আসবাবপত্র অকারণ অহেতুক উল্লাসে কেটে ছিঁড়ে ভেঙে নষ্ট করা, গাড়িসুদ্ধ লোকের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ভাড়া দিতে অস্বীকার

করা ত নেহাৎ ছোটখাট ব্যাপার। স্বাধীন হওয়ার এসব লক্ষণের আজও অভাব নেই, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনগণের নানা স্তরে আলস্য ঔদাসীন্য লুব্ধতা অসাধুতার অবাধ বিস্তার। কেরানী কি ওই মাপের কর্মী হলে আমরা নির্বিকারভাবে কাজে ফাঁকি দিই, আর নতুন পাওয়া সংঘশক্তির অপব্যবহার করে নিজেদের গাফিলি ও অক্ষমতার তিরস্কার কি শাস্তি নির্লজ্জভাবে নাকচ করি, ধনী ব্যবসায়ী হ'লে আমরা অকুতোভয়ে খাদ্যে ওষুধে ভেজাল দিই, আইনের অনেক পাকে জড়ানো বাহুকে অচল করবার বহু উপায় আছে জেনে শিল্পপতি হলে আমরা রাষ্ট্রের পক্ষছায়ার সুযোগ নিয়ে শুল্কের দেওযালে প্রতিযোগিতাকে ঠেকিয়ে রেখে নিরেস মাল সরেসের নামে ও দামে চালাই, উৎকর্ষ সাধনের সব দায় এড়িয়ে। ~

সব দেখে শুনে এই সন্দেহই হয় যে, বাইরে যাই ঘটুক, অন্তরে পরাধীনতার বেড়ি আমাদের এখনো ভাঙেনি। বাড়ির মালিকানা পেয়ে গেলেও আমাদের দৃষ্টিটা এখনো যা-পাই-হাতাই গোছের লুটেরার। জেলের কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কোন একদিন তাদের চাবিতালা ও ডাণ্ডা সমেত অদৃশ্য হলে কয়েদীরা যা করে, আমরা প্রায় তাই করেই চলেছি, লক্ষ্যহীন, দায়িত্বহীন, স্বার্থসর্বস্ব স্বেচ্ছাচারিতায়। ~

স্বাধীনতা মানে যে সত্য ও ন্যায়ের অলঙ্ঘনীয় শাসনে নিজেকে স্বেচ্ছায় বাঁধা, এই কথাই আমাদের আবিষ্কার করা এখনো বাকি।

সামনে পনেরাই আগস্ট এসে পড়েছে বলেই মনে এসব ভাবনার আলোড়ন উঠেছে সন্দেহ নেই।

পোনেরোই আগস্ট আমার কাছে শুধু একটা পঞ্জিকার তারিখ মাত্রই নয়। জ্বালা, ক্ষোভ আত্মধিক্কার যতই থাক ওই তারিখটি আমার মত অনেকের কাছেই বোধহয় একটি জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা। দিগন্ত উদ্ভাসিত-করা একটি বিরাট ইঙ্গিত নিয়ে এই দিনটি উদয় হয়।

তারিখটির এই পবিত্র মহিমা আমাদের মনগড়া সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনের সব কিছু মহৎ মধুরই ত মন দিয়েই গড়তে হয়। সব জায়গার মাটিই হয়ত এক তবু দেবায়তনের জন্যে যে জায়গাটুকু, নির্দিষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে তাকে ঘিরতে না পারলে আমাদের নিজেদের মনই নিরাকার শূন্যতায় ধূসর হয়ে থাকে।

এই নিরাকার শূন্যতা যোগীর ধ্যান হ'তে পারে কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের নয়। আমাদের মন বস্তুর আশ্রয় চায়, চায় ভাবের প্রতীকের।

তাই ১৫ই আগস্ট তারিখটি ১৪ই আগস্টের পরের দিন মাত্র নয়, আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় স্পন্দন তোলা একটি জাগ্রত প্রতীক।

আর কিছু না হোক, শুধু নিজেদের লজ্জা দেবার জন্যেই সে প্রতীকটিকে উৎসবে আড়ম্বরে অসামান্য ক'রে তোলা আশু প্রয়োজন।